শুকতারা

পঞ্চচত্বারিংশৎবর্ষ • তৃতীয় সংখ্যা • বৈশাখ ১৩৯৯

ভেলকির খেলা

ধারাবাহিক চিত্রকাহিনী

স্প্যানিয়ার্ড যোদ্ধা আতঙ্ক-বিহ্বল হয়ে আত্মসমর্পণ করল না — শিকারের পায়ে কামড় বসাল হাঙর — তৎক্ষণাৎ তার দেহে বিদ্ধ হল শাণিত ছুরিকা.. নরখাদক মৎস্যের শীতল রক্তের সঙ্গে মিশল তপ্ত নররক্ত ... ব্ল্যাক বিয়ার্ড ও তার দলবল জাহাজ থেকে সাগ্রহে দেখতে লাগল হাঙর ও মানুষের মৃত্যুপণ লড়াই..

পরবর্তী অংশ ভিতরে ...

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - হরিদাস পাল

স্ক্যান করেছেন - হরিদাস পাল

এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা স্ক্যান করতে চান কিংবা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেলে যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

optifmcybertron@gmail.com

ডায়মন্ড কমিকসের নিবেদন

কার্টুনিস্ট প্রাণের অমর সৃষ্টি চাচা চৌধুরী তাঁর প্রখর বুদ্ধির জোরে যে কোনও সমস্যার সমাধান মুহূর্তের মধ্যে করে ফেলেন। ওনার সংগী জুপিটারবাসী সাবু অসীম শক্তির অধিকারী।

চাচা চৌধুরী সিরীজ

চাচা চৌধুরী ও রাকা
চাচা চৌধুরীর দুমদাম
চাচা চৌধুরী অন্তরীক্ষে
চাচা চৌধুরী ও নরখাদক
চাচা চৌধুরী ও ব্যাঙ্ক লুটেরা
চাচা চৌধুরী ও সাবুর অপহরণ
চাচা চৌধুরী ও আকবরী খাজানা
চাচা চৌধুরী ও গোলামের বিক্রী
চাচা চৌধুরী ও রাকার সংগে সংঘর্ষ
চাচা চৌধুরী আর কারবেকের সোনা
চাচা চৌধুরী আর হাইওয়ের ডাকাত
চাচা চৌধুরী আর ইব্‌নে বতুতা
চাচা চৌধুরী আর বিদেশী গাড়ী
চাচা চৌধুরী আর আরমান আলী
ফারমান আলী
চাচা চৌধুরী আর এক কোটির হীরে
চাচা চৌধুরী আর যুধিষ্টিরের মুকুট
চাচা চৌধুরী সুবিচার
চাচা চৌধুরী ও
গব্বর সিং-এর মোকাবিলা
চাচা চৌধুরী চোরের খোঁজে
চাচা চৌধুরী আর বোতলের দৈত্য
চাচা চৌধুরী ও
শিকারী লকড়বগ্গা সিং
চাচা চৌধুরী ও কারাটে সম্রাট
চাচা চৌধুরী ও সাবু কালো দ্বীপে
চাচা চৌধুরী ও হাতীর ব্যবসা
চাচা চৌধুরী ও সাবুর ওপর আক্রমণ
চাচা চৌধুরী ও চম্পত-সম্পত
চাচা চৌধুরী ও সাবুর হাতুড়ী
চাচা চৌধুরী ও পোপটলাল
চাচা চৌধুরী ও পটলার কোমর
চাচা চৌধুরী ও হাকিম জামালগোটা
চাচা চৌধুরী ও রাকার পুনরাগমন
চাচা চৌধুরী ও রাকার প্রতিশোধ
চাচা চৌধুরী ও ম্যাডাম জোরো
চাচা চৌধুরী ও উড়ন্ত গাড়ী
চাচা চৌধুরী ও রহস্যময় চোর
চাচা চৌধুরী ও সাবুর বুট
চাচা চৌধুরী ও সাবুর বিয়ে
চাচা চৌধুরী ও হীরের চাষ
চাচা চৌধুরী ও ক্রিকেট ম্যাচ
চাচা চৌধুরী ও রোবোট
চাচা চৌধুরী বিল্লু ও পিঙ্কী
চাচা চৌধুরী আমেরিকায়
চাচা চৌধুরী জুপিটারে
চাচা চৌধুরী আর বেনারসী জোচ্চোর
চাচা চৌধুরী আর রাকার আক্রমণ
চাচা চৌধুরী ডাইজেস্ট i
চাচা চৌধুরী ডাইজেস্ট ii
চাচা চৌধুরী ডাইজেস্ট iii
চাচা চৌধুরী ডাইজেস্ট iv
চাচা চৌধুরী ডাইজেস্ট v
চাচা চৌধুরী ডাইজেস্ট vi
চাচা চৌধুরী ডাইজেস্ট vii
চাচা চৌধুরী ডাইজেস্ট viii
চাচা চৌধুরী ডাইজেস্ট ix

কার্টুনিষ্ট প্রাণের আরেকটি স্মরণীয় সৃষ্টি চঞ্চল, দুষ্ট পিঙ্কী তার অদ্ভূত-অদ্ভূত কান্ড-কারখানা দিয়ে তোমাদের পেটে খিল ধরিয়ে দেবে।

পিঙ্কী সিরীজ

পিঙ্কীর পুসী
পিঙ্কীর ক্যামেরা
পিঙ্কীর জন্মদিন
পিঙ্কীর কুকুরছানা
পিঙ্কীর মা ও বাবা
পিঙ্কী আর জোকার
পিঙ্কী আর হাতেমতাই
পিঙ্কী আর দিদিমার গল্প
পিঙ্কী আর নাবানের বুদবুদ
পিঙ্কী আর চাচা সুলেমানী
পিঙ্কী আর ঝপটজীর ঘুড়ি
পিঙ্কী আর চ্যারিটীর টিকিট
পিঙ্কী আর বিনা পয়সার কুল
পিঙ্কী আর বৃন্দনলাল পাগড়ীওয়াল।
পিঙ্কী আর রুস্তমজী
পিঙ্কী আর মিয়া চিলগোজা
পিঙ্কী আর জু মন্তর
পিঙ্কী আর বাঙালী রসগোল্লা
পিঙ্কীর জুতো
পিঙ্কীর পুতুল
পিঙ্কী ডাইজেস্ট i
পিঙ্কী ডাইজেস্ট ii
পিঙ্কী ডাইজেস্ট iii
পিঙ্কী ডাইজেস্ট iv

চঞ্চল চরিত্র বিল্লুর দুষ্টুমী ভরা মজার মজার কান্ড-কারখানা পড়ে তোমরা না হেসে থাকতে পারবে না।

বিল্লু সিরীজ

বিল্লু আর রাবণের মাথা
বিল্লু আর ফিল্ম শো
বিল্লুর বন্ধু
বিল্লু হোস্টেলে
বিল্লুর হোমওয়ার্ক
বিল্লু পিকনিকে
বিল্লুর সোফ্‌টী
বিল্লুর দুষ্টুমী
বিল্লু আর হাতীর ভ্রমণ
বিল্লু আর বজরংগী পালোয়ান
বিল্লু ডাইজেস্ট i
বিল্লু ডাইজেস্ট ii
বিল্লু ডাইজেস্ট iii

৩০০ বছর ধরে জংগলে শান্তি বজায় রেখে আসছে চলমান অশরীরী ওরফে ফ্যান্টম। প্রাচীন কাল থেকে বংশানুক্রমে অপরাধীদের কাছে সাক্ষাৎ যমদূত ফ্যান্টম-এর কাহিনী বাচ্চা-বুড়ো সবাইকে আনন্দ দেবে।

ফ্যান্টম সিরীজ

ফ্যান্টম ডাইজেস্ট i
ফ্যান্টম ডাইজেস্ট ii
ফ্যান্টম ডাইজেস্ট iii
ফ্যান্টম ডাইজেস্ট iv
ফ্যান্টম ডাইজেস্ট v
ফ্যান্টম ডাইজেস্ট vi
ফ্যান্টম ডাইজেস্ট vii
ফ্যান্টম ডাইজেস্ট viii
ফ্যান্টম ডাইজেস্ট ix
ফ্যান্টম ডাইজেস্ট x
ফ্যান্টম ডাইজেস্ট xi
ফ্যান্টম ডাইজেস্ট xii
ফ্যান্টম ডাইজেস্ট xiii
ফ্যান্টম ডাইজেস্ট xiv
ফ্যান্টম ডাইজেস্ট xv
ফ্যান্টম ডাইজেস্ট xvi

Diamond Comics Pvt. Ltd.
2715, DaryaGanj, New Delhi-110002.

DISTRIBUTORS : **VISHAL BOOK CENTRE** 4, TOOTI LANE, CALCUTTA-16

বাঁটুল দি গ্রেট

জ বদের ডিমেদের
জন্যে কোন সাহায্য
,থানেদার সাহেব?
থানা
নাঃ! তুমি ওদের আমার ওপর ছেড়ে দাও।
তুমি যদি কোন সাময়িক খুচরো কাজ করতে চাও, তাহলে তুমি এই অফিস ঘরের ফায়ার প্লেসের চিমনিটা সাফাই করো।
বার দুয়েক ভালো করে ধাক্কা দিলেই এটা পাক্কা সাফ হয়ে যাবে।
থানা
দমাস!
ওয়াফ্স্!
এখান থেকে কেটে পড়ো দস্যি কোথাকার, আমাকে শান্তিতে থাকতে দাও!
ই যে, বাঁটুল! আমার এই পথটা
াফ করে দিলে আমি তোমাকে
কুড়ি টাকা দেবো।
ঠিক আছে!
কি পাথুরে পথ!
এবার আমি শান্তিতে একটু হাল্কা নিদ্রা দিয়ে নিতে পারি।
থানা

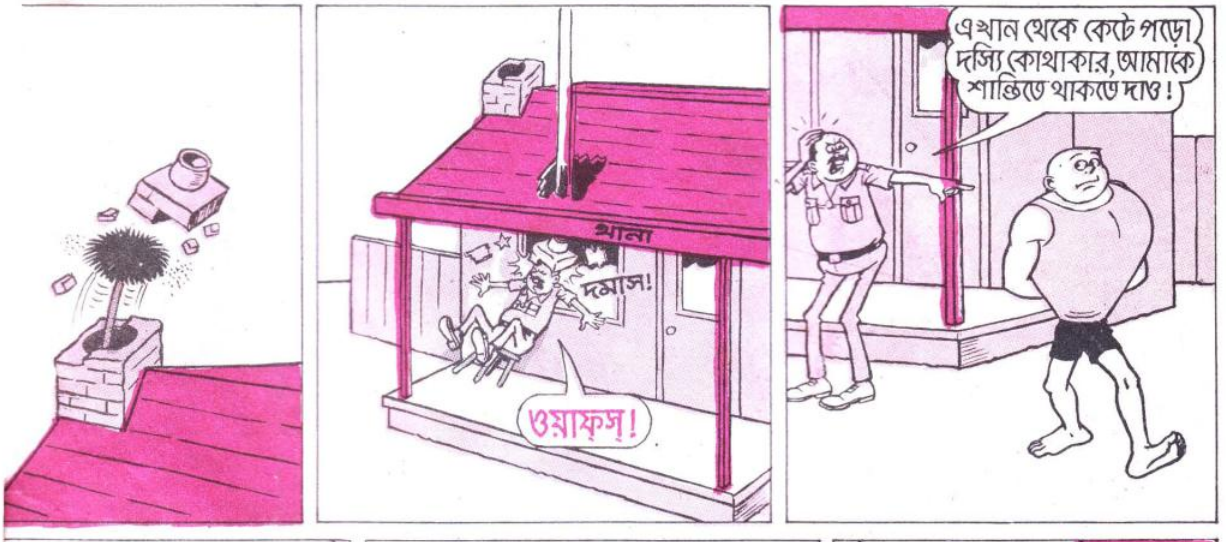

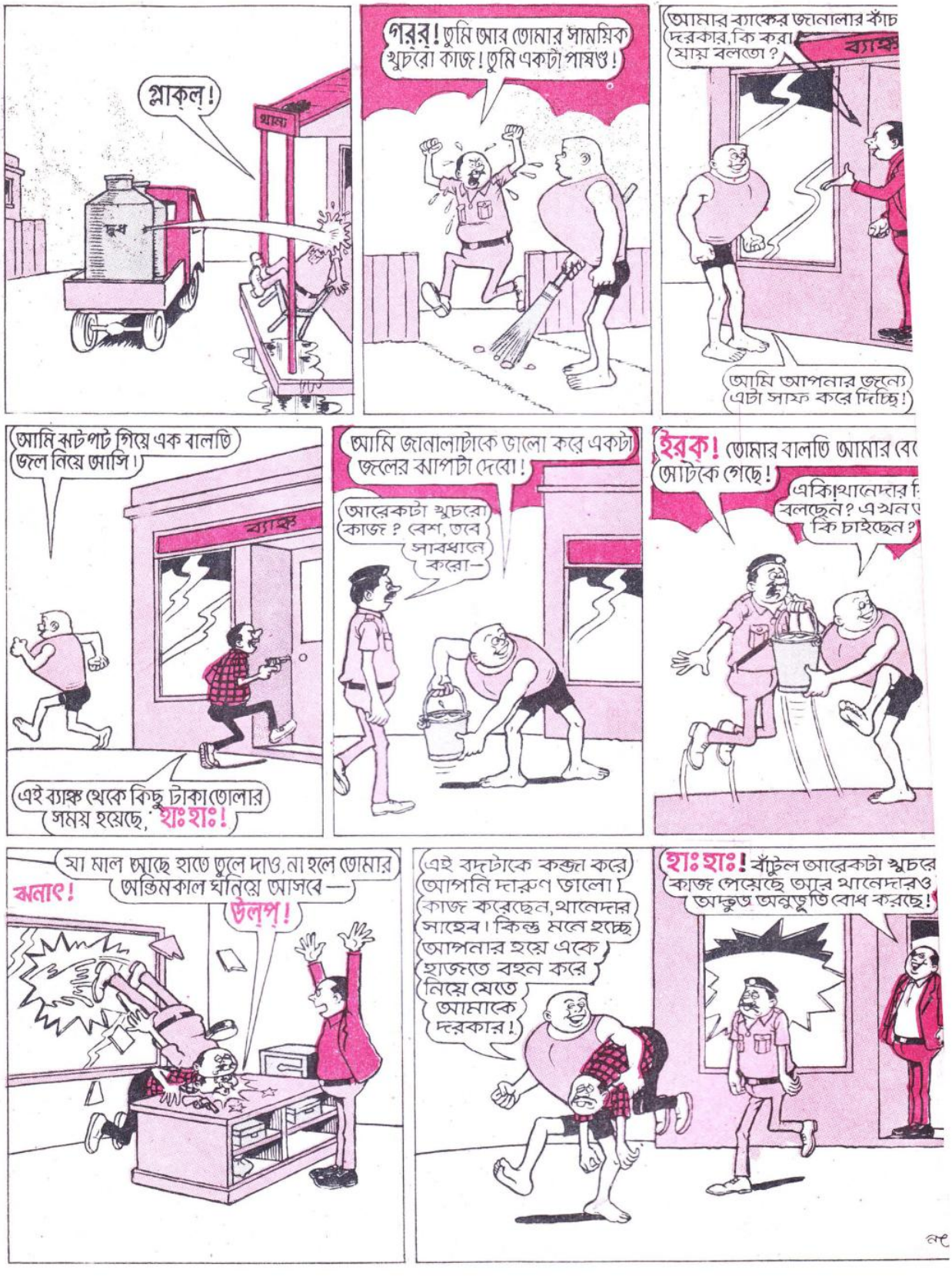

গ্লাকৃল্!
থানা
দুধ
গরর! তুমি আর তোমার সাময়িক খুচরো কাজ! তুমি একটা পাষণ্ড!
আমার ব্যাঙ্কের জানালার কাঁচ দরকার, কি করা যায় বলতো?
ব্যাঙ্ক
আমি আপনার জন্যে এটা সাফ করে দিচ্ছি!
আমি ঝটপট গিয়ে এক বালতি জল নিয়ে আসি।
ব্যাঙ্ক
এই ব্যাঙ্ক থেকে কিছু টাকা তোলার সময় হয়েছে, হাঃ হাঃ!
আমি জানালাটাকে ভালো করে একটা জলের ঝাপটা দেবো!
আরেকটা খুচরো কাজ? বেশ, তবে সাবধানে করো—
ইরক্! তোমার বালতি আমার বে
আটকে গেছে!
একি! থানেদার
বলছেন? এখন
কি চাইছেন?
যা মাল আছে হাতে তুলে দাও, না হলে তোমার অন্তিমকাল ঘনিয়ে আসবে—
ঝনাৎ!
উলপ!
এই বদটাকে কব্জা করে আপনি দারুণ ভালো কাজ করেছেন, থানেদার সাহেব। কিন্তু মনে হচ্ছে আপনার হয়ে একে হাজতে বহন করে নিয়ে যেতে আমাকে দরকার!
হাঃ হাঃ! বাঁটুল আরেকটা খুচরে কাজ পেয়েছে আর থানেদারও অদ্ভুত অনুভূতি বোধ করছে!

শুকতারা

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত ছোটদের সেরা মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

বৈশাখ ১৩৯৯ এপ্রিল ১৯৯২

প্রচ্ছদ
ভেলকির খেলা (রঙিন ছবিতে গল্প)
—ময়ূখ চৌধুরী

ধারাবাহিক
রক্তসরার দ্বীপ (উপন্যাস)
—রমেন দাস ১৬৪
ত্রয়ীর অভিযান (একটি ঘরের রহস্য) —পরাশর রায় ১৫২
টারজান মহীয়ান (অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী)—সব্যসাচী ১৯১

গল্প
হাওয়া-চরকি—কুমারেশ ঘোষ ২০৯

রূপকথার গল্প
পুরস্কার—গৌরী সেন ১৯৯

ভূতের গল্প
ওয়েটিংরুমে সেই রাত্রে
—প্রভাস মল্লিক ১৬৮

উপকথা
চোরের উপর বাটপাড়ি
—উৎপল চৌধুরী ১৫০

শিকারের গল্প
শিকারী থেকে সন্ন্যাসী
—প্রিয়রঞ্জন মৈত্র ১৫৭

বিজ্ঞানের গল্প
কয়লাখনিতে
—বিজয়া বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭২

পুরাণের গল্প
গ্রহান্তর থেকে ফিরে
—নন্দলাল ভট্টাচার্য ১৯৭

পুরস্কৃত গল্প
আলোয় ফেরা (প্রথম)
—অলক দত্তচৌধুরী ২১২
ভাইফোঁটার মজা (দ্বিতীয়)
—শঙ্কর চক্রবর্তী ২১৩

অগ্নিযুগের সৈনিক
ছত্তিশগড়ের নারায়ণ সিং
—চরণ দাস ২০৩

জীবন থেকে নেওয়া
গ্রাম্ফির গোঁ—আরতি বসু ২১৫

ফিচার
একটি রহস্যময় ঘটনা
—জ্যোতির্ময় মজুমদার ১৫১
বিজ্ঞানের খবর—সন্দীপ সেন ১৭৫

বিশ্ববিচিত্রা
জিজ্ঞাসা ১৬১
সত্যি! ১৯৬

কবিতা
বারো মাসের পিঠেপুলী
—অবনী সাহা ১৪৯
দুষ্টু খুকুর দুষ্টুমি
—অমলেন্দু সামুই ১৫৬

ছবিতে গল্প
বাঁটুল দি গ্রেট (রঙিন)
—নারায়ণ দেবনাথ ১৪৫
বাহাদুর বেড়াল (রঙিন)
—নারায়ণ দেবনাথ ১৭৯
হাঁদা-ভোঁদা—নারায়ণ দেবনাথ ২১০
বিলির বুট (রঙিন) ১৬২
ছদ্মবেশে ম্যাম'জেল এক্স ১৯৪

বিভাগীয় লেখা
খেলা—শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮১
পড়ার সঙ্গে খেলা
—বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯
শরীর গড়তে যোগ ও ব্যায়াম
—তুষার শীল ১৯০
দাদুমণির চিঠি ১৭৬
তোমাদের পাতা ১৭৭
মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি) ২০৫
কার্টুন—অমল ২০৭

ঘোষণা
অতীন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতা ২১৪
জানো কী ২০৭

APPROVED BY THE DIRECTORATE OF PUBLIC INSTRUCTION WEST BENGAL AS CHILDREN'S MONTHLY MAGAZINE VIDE MEMO NO. 456 (17)-T.B.C. (Dated 5-7-88)

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য - হাতে নিলে ৯০ টাকা। ডাকে ঃ বুক পোস্টে - ১১০ টাকা, রেজিস্ট্রি ডাকে ১৭০ টাকা।

R.N.I.
Registration No. 2621/57

দাম ঃ ৮ টাকা মাত্র

শ্রীম কথিত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত

(২য় মুদ্রণ)

অখন্ড দিনানুক্রমিক পুণ্যচরিত

দাম ঃ এক শত টাকা মাত্র

প্রকাশিত হলো নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গরঙ্গমঞ্চ

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব সূত্রে রঙ্গমঞ্চের নেপথ্য ইতিহাস

দাম ঃ চল্লিশ টাকা মাত্র

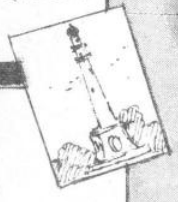

ডঃ বাসন্তী চৌধুরীর

সঙ্গীত দর্শন

দাম ঃ কুড়ি টাকা মাত্র

রাধারমণ রায়ের

কলকাতা বিচিত্রা

আদি যুগ থেকে স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত কলকাতার ইতিহাস

দাম ঃ পঞ্চাশ টাকা মাত্র

প্রসাদ সেনের

রবীন্দ্র সঙ্গীতে মিলনমেলা

রবীন্দ্রনাথের গানে কোথা থেকে কোন সুরের উৎপত্তি এবং তা কেমন করে মূলধারায় এসে মিলেছে, এ সবই সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে।

দাম ঃ তিরিশ টাকা মাত্র

সোমনাথের

শিবঠাকুরের বাড়ি

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ ও পঞ্চকেদার ভ্রমণ কাহিনী

দাম ঃ ষোল টাকা মাত্র

বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

এই কলকাতায়

আনাচে কানাচে ছড়িয়ে থাকা মন্দির মসজিদ আর গীর্জার ইতিহাস

দাম ঃ বারো টাকা মাত্র

Dr. D. Chandra's SOURCES OF ENERGY

The Story of Petroleum
The Story of Coal
The Story of Nuclear Energy
The Story of Solar Energy
The Story of Water Energy
The Story of Wind Energy (In Press)

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ, ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা–৭০০০০১

শুকতারা

৪৫শ বর্ষ ● ৩য় সংখ্যা ● বৈশাখ ১৩৯৯/এপ্রিল ১৯৯২

বারো মাসের পিঠে পুলি

অবনী সাহা

বোশেখ জৈষ্ঠ আমের মাস
ফজলী, ল্যাংড়া, গোলাপখাস
কত রকম মধুর বাস
বাস রে
সারা বছর হতো যদি চাষ রে।
আষাঢ়েও আম কাঁঠাল
ঘন দুধে দিয়ে জ্বাল
জ্বাল রে
আহা, এমনি করে কাটতো যদি কাল রে।

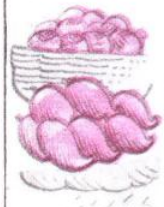

শাওনে তাল, তালের বড়া
ভাদ্রেও তা হয় না সারা
ভাই রে
বারো মাসের পিঠের গান গাই রে।
আশ্বিনেতে চিতই পিঠে
পরমান্নে লাগে মিঠে
মিঠে রে
নাটাই ব্রতের পিঠে লাগে দিঠে রে।

কার্তিক অঘ্রাণ দুই মাস
চাষীর ঘরে ফুলবাতাস
নবান্নের ধুম লেগে যায়
যায় রে।
সারা গাঁয়ের ছেলে বুড়ো খায় রে।
পৌষ মাঘেতে পিঠে পুলি
মাসকলাইয়ের সরুচাকুলি
বলতো ভাই কেমনে ভুলি
ভাই রে।
বারো মাসের পিঠের গান গাই রে।

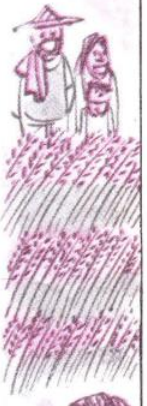

ফাল্গুন চৈত্র দুটি মাস
কার পৌষ কার সর্বনাশ
নীলের পুজোয় মত্ত যে হই ভাই রে।
বাবার নামে রই সকলে
ছেলে বুড়ো সবাই মিলে
চড়ক পুজোর মজা কোথায় পাই রে।

ছবিঃ অমল চক্রবর্তী

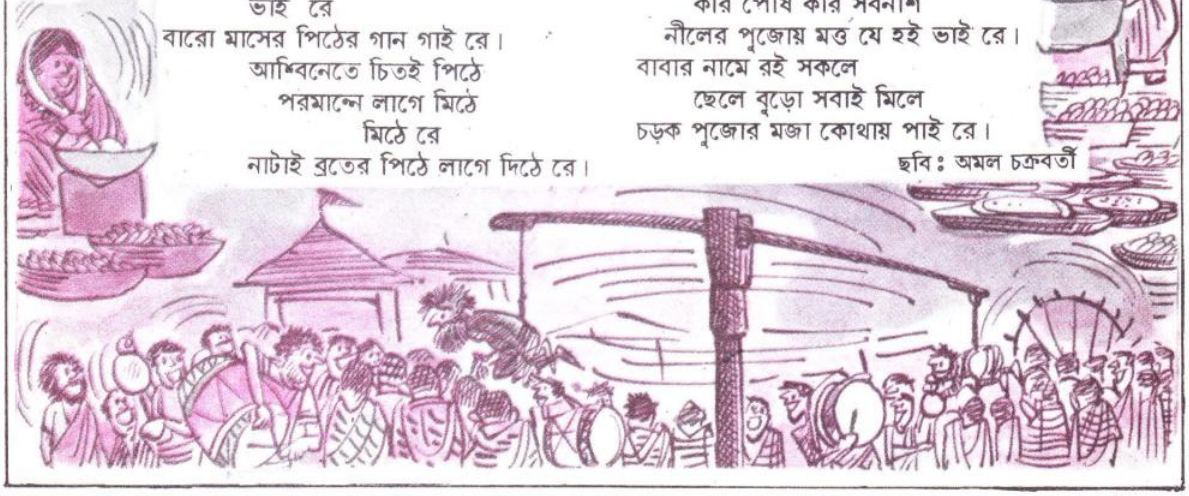

চোরের উপর বাটপাড়ি

উৎপল চৌধুরী

দুই ভাই। রেকুক্কা আর পগতি চুক্কা। দু'জনের খুব ভাব। একজন চুরি করে রাতে আর অন্যজন ডাকাতি করে দিন-দুপুরে। তাদের বাবা অনেকদিন হলো মারা গেছে। বাবাও ছিল এককালের ডাকসাইটে চোর। ফলে উত্তরাধিকার সূত্রে এই গুরুবিদ্যাটি দু'ভাইয়েই রপ্ত করেছিল নিখুঁতভাবে। আর এর দৌলতে দিন কাটছিল তাদের বেশ স্বচ্ছন্দে। কোনো অভাব ছিল না তাদের।

একদিন দু'ভাইয়ের কেউ-ই কাজে বার হয়নি। বাড়ির দাওয়ায় বসে চুরি-ডাকাতির বিভিন্ন অভিজ্ঞতা আর ছল-চাতুরির কথা বলাবলি করছিল তারা। হঠাৎ ছোট ভাই পগতি চুক্কার মাথায় এল এই মহাবিদ্যায় তাদের দু'ভাইয়ের মধ্যে কে বেশি ওস্তাদ সেটা তো জানা হয়নি। সুতরাং ছোট ভাই তার চিন্তাটা সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিল দাদা রেকুক্কাকে।

রেকুক্কা বলল, 'ঠিক কথা। আরে এটা তো কখনও আমার মাথায় আসেনি। ঠিক আছে, তুই-ই প্রথম প্রমাণটা দে।'

পগতি বলল, 'তুমি বয়সে বড়। তুমিই শুরু কর আগে।'

রেকুক্কা বলল, 'তাহলে আয় আমার সঙ্গে।'

–'কোথায়?' অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে পগতি।

–'আয়-ই না।'

এই বলে রেকুক্কা ভাইকে নিয়ে হাজির হলো গাঁয়ের সীমানায় একটা জঙ্গলের ধারে। তারপর বিশাল একটা বটগাছের মগডালে পাখির কয়েকটা বাসা দেখিয়ে রেকুক্কা ভাইকে বলে, 'তুই একটু দাঁড়া। ঐ মগডাল থেকে আমি এমন সন্তর্পণে পাখির ডিম চুরি করে আনব যে, কাকপক্ষী, এমন কি তুই-ও টের পাবি না।'

কথাটা শেষ করেই রেকুক্কা সড়সড় করে নিমেষের মধ্যে উঠে গেল গাছে আর পরক্ষণেই হারিয়ে গেল বিশালকায় বটগাছের ঘন সবুজ ডাল-পাতার আড়ালে। পগতি চুক্কা অনেক চেষ্টা করেও দাদাকে আর দেখতে পেল না।

এদিকে কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর গাছের চারপাশটা ঘুরতে ঘুরতে কি সব ফন্দি ফিকির আঁটতে লাগল পগতি আর চারপাশে সতর্ক চোখ রাখল।

আচমকা একটা ডাল থেকে ঝুপ করে নামল রেকুক্কা। নেমেই একটু গর্বিত হাসি হেসে ভাইকে বলল, 'যাক কাজ শেষ। দেখেছিস একটা পাখিও ডাকাডাকি করছে না।'

পগতি চুক্কাও দাদার দেখাদেখি হাসল একটুখানি। 'না, বলতেই হবে তুমি জাদু জানো। নাও এবার ডিম দুটো বার করো দেখি।'

রেকুক্কা কেমন যেন একটু ঘাবড়ে গেল। 'দুটো ডিম তুই জানলি কেমন করে?'

এই না বলে যেই পকেট থেকে হাত বার করেছে সে, চোখ তো ছানাবড়া। এ কি! দুটো ডিম সে লুকিয়ে আনল আর এখন আছে মাত্র একটা। অন্য ডিমটার বদলে তার পকেটে রয়েছে একটা নুড়ি পাথর!

হো-হো করে খুব জোরে হেসে উঠল ছোটভাই পগতি চুক্কা। দাদাকে আর ধাঁধায় রাখতে চাইল না সে। নিজের পকেট থেকে একটা ডিম বার করে দাদাকে দিয়ে বলে, 'এই নাও তোমার অন্য ডিমটা। আমি নুড়ির সঙ্গে এটা বদল করেছি মাত্র।'

একেই বোধহয় বলে, চোরের উপর বাটপাড়ি।

ছবি: বিজন কর্মকার

অনেক দিন আগে একটা মজার আর বেশ ইন্টারেস্টিং খবর পড়েছিলাম। আমেরিকায় নাকি Encyclopaedia of Ignorance বলে একটা বই বেরিয়েছে। অর্থাৎ এ বইয়ে পৃথিবীতে জ্ঞানবিজ্ঞানের জগতে আমরা যা জানি না, বুঝি না বা রহস্যময় ঠেকছে যেমন বার্মুডা ট্রাংগল্ ধরনের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সাধারণত এনসাইক্লোপিডিয়া বা বিশ্বকোষ জাতীয় গ্রন্থে আমরা যা জানি তাই নিয়ে অনেক ধানাই পানাই থাকে। আর যত দিন যাচ্ছে আমাদের ততই জ্ঞানবৃদ্ধি হচ্ছে আর স্বভাবতই বিশ্বকোষগুলো সংখ্যায় বা আয়তনে বৃদ্ধি পাচ্ছে (যদিও রেলস্টেশন বাসস্টেশনে বা সরকারি হাসপাতালে অপেক্ষা করতে করতে একেক সময় এই জ্ঞানবৃদ্ধির ব্যাপারটা নিয়ে খুবই সন্দেহ হয়)।

একটি রহস্যময় ঘটনা

জ্যোতির্ময় মজুমদার

পুস্তক সমালোচনার সময় একজন সমালোচক মজা করে লিখেছিলেন, আশা করা যায় যে অন্তত এই 'অজ্ঞানকোষ'-এর যত নতুন সংস্করণ বেরোবে তা আগের তুলনায় পাতলা হবে, কেন না আমাদের জ্ঞান বাড়বে বৈ কমবে না।

যাক গে এবার এক অজানা রহস্যের জাল কি করে ছেঁড়া হলো তাই বলি। চতুর্থ শতাব্দীতে রোমের সম্রাট ডাওক্লেটিয়ান (Diocletian) চারজন নাগরিককে মৃত্যুদণ্ড দেন। সে এক ভয়ংকর মৃত্যুদণ্ড। ঐ হতভাগা নাগরিকদের হিংস্র জন্তুদের সামনে ছেড়ে দেওয়া হবে আর তাদের খাবা বা মুখেই হবে এদের মৃত্যু। রোমের সম্রাটের চোখে ঐ নাগরিকরা ছিল মহাপাপী, কারণ তারা ছিল খ্রীষ্টান। সে আমলে রোমে খ্রীষ্টানদের শাস্তি দেবার এটাই ছিল রেওয়াজ। এ সময় রোমে খ্রীষ্টধর্মের প্রচারক ছিলেন সেন্ট জানুয়ারিয়াস (St. Januarius) (না, এঁর নামে জানুয়ারী মাসের নাম হয়নি, সেটা অন্য ব্যাপার)। তাঁর এমনই দিব্যশক্তি যে হিংস্র জানোয়াররা ঐ নাগরিকদের কোনোই ক্ষতি করতে পারেনি; শেষকালে সম্রাট ডাওক্লেটিয়ান জহ্লাদ ডেকে এদের মুণ্ডু কেটে হত্যা করেন। কিন্তু সেন্ট জানুয়ারিয়াসের দিব্যশক্তির শেষ এখানেই হয়নি। তাঁর শরীরের জমাট রক্ত ইটালীর নেপল্স্ শহরের এক চার্চে কাচের পাত্রে সযত্নে রক্ষিত আছে। আমরা সবাই জানি যে রক্ত শরীর থেকে বার করে রেখে দিলে তা কিছুক্ষণের মধ্যেই জমাট বেঁধে যায়, তাকে আর তরলায়িত করা যায় না। মজার ব্যাপার সেন্ট জানুয়ারিয়াসের ঐ রক্ত বছরে অন্তত আঠারোবার গলে গিয়ে প্রায় টাটকা রক্তে পরিণত হয়। নেপল্স্-এর চার্চের ধর্মযাজকরা বছরের বিশেষ আঠারো দিনে ঐ পাত্র বার করে সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রীর সামনে ধরেন আর তাঁদের চোখের সামনেই জমাট রক্ত গলে তাজা রক্ত হয়ে যায়। এ আশ্চর্য ঘটনা বহুদিন ধরেই হচ্ছে। ব্যাপারটা কেউ ধরতে পারেনি।

এখন ইটালীর পাভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নবিদ লুইগি গারলাসচেলী মনে হচ্ছে এ রহস্যের সমাধান করতে পেরেছেন। অক্টোবর মাসের নেচার পত্রিকায় তিনি এক প্রবন্ধে জানিয়েছেন যে মধ্যযুগের রাসায়নিকদের এমন অনেক কায়দাকানুন জানা ছিল যা দিয়ে এ ঘটনাটা বোঝা যায়। মিঃ গারলাসচেলী ক্যালসিয়াম কারবোনেট (চকের গুঁড়ো)-এর সংগে ফেরিক ক্লোরাইড (যা আগ্নেয়গিরির পাথরে পাওয়া যায়) মেশান তারপর অন্যান্য রাসায়নিক প্রক্রিয়ার পর আস্তে আস্তে তা চটচটে জেলীতে পরিণত করেন। তারপর এই জেলীকে জোরে ঝাঁকালেই তা তরল পদার্থে পরিণত হয়, আবার কিছুক্ষণের মধ্যেই তা জমাট বেঁধে যায়। কয়েক শতাব্দী আগে সেই জানুয়ারিয়াসের রক্তে কি কেউ চক আর ফেরিক ক্লোরাইড মিশিয়েছিলো? রোমান ক্যাথলিক চার্চ এখনও এই রক্ত পরীক্ষা করতে দিতে রাজী হননি। এখন জানা গেছে যে অন্তত সাত বার এই রক্ত সাধারণ দিনে সাধারণ লোকের হাতে পড়েও গলে গেছে, স্বভাবতই সন্দেহ হয় যে ব্যাপারটা বুজরুকি। এক সাকরাকে ঐ কাচের পাত্র মেরামত করতে দেওয়া হয়েছিল, তা মেরামতির সময় ঝাঁকুনিতেই এই রক্ত গলে যায়। হতে পারে অনেকদিন আগে অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন কিছু রসায়নবিদ-ধর্মযাজকদের হাতে এই রহস্যের সৃষ্টি।

ত্রয়ীর অভিযান

পরাশর রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

একটা গাছের নিচের অন্ধকার থেকে ইন্সপেক্টার রথীন মিত্র ছুটে এলেন। সশস্ত্র পুলিশের দায়িত্বে ছিলেন যে অফিসার তিনি ইন্সপেক্টার মিত্রকে স্যালুট করলেন। রথীন মিত্র বললেন–'ঘোষ, শীগগির 'মিত্রবাড়ি'টা ঘিরে ফেলো। কয়েকজন আমার সঙ্গে আসুক।'

গাছের ঝোপঝাড়ের ছায়ার মধ্যে দিয়ে সশস্ত্র পুলিশেরা বন্দুক উঁচিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল। একটু পরেই 'মিত্রবাড়ি'র কাছে এল ওরা। নিঃশব্দে ছড়িয়ে পড়ল। ঘিরে ফেলল বাড়িটা।

ইন্সপেক্টার রথীন মিত্র কোমরের খাপ থেকে রিভলভার বের করলেন। তারপর অফিসার মিঃ ঘোষ ও দুজন পুলিশ নিয়ে নিঃশব্দে আস্তে আস্তে 'মিত্রবাড়ি'র ভাঙা দেউড়ি পেরোলেন। রথীন মিত্র এবং মিঃ ঘোষ দুজনের হাতেই উদ্যত রিভলভার। মারুতি গাড়িটার পাশ দিয়ে রথীন মিত্র মাথা নিচু করে এগোলেন। ড্রাইভারের দরজাটা একটানে খুলে ফেললেন। লাফিয়ে উঠলেন আর সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভারের চোয়ালের নিচে রিভলভারের নল চেপে ধরলেন। চাপাস্বরে বললেন–'টুঁ শব্দটি করো না। নেমে এসো।' ড্রাইভার তো হতভম্ব। পালাবে কি, ভয়ে ওর হাত-পা কাঁপতে লাগল। আস্তে আস্তে গাড়ি থেকে নিচে নেমে এল। মিঃ ঘোষ এগিয়ে এসে ওর হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলেন। রথীন মিত্র ড্রাইভারের পিঠে রিভলভারের নল ঠেকিয়ে বললেন–'চলো।' দুজনে আস্তে আস্তে এসে সদর দরজার সামনে দাঁড়াল। পেছনে মিঃ ঘোষ। রথীন মিত্র চাপাস্বরে বললেন–'কড়া নাড়ো।' ড্রাইভার কাঁপা কাঁপা-হাতে কড়া নাড়ল। ভেতর

থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। রথীন মিত্র বললেন–'আবার নাড়ো।' ড্রাইভার আবার কড়া নাড়ল। ভেতরে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। দরজার কাছে এসে কাল্লু বলল–'কৌন হ্যায় ?'–'আমি ড্রাইভার–পচা।' ড্রাইভার বলল।

দরজা খুলে গেল। রথীন মিত্র একলাফে ভেতরে ঢুকে কাল্লুর কপালে রিভলভার ঠেকালেন। চাপাস্বরে বললেন–'চিল্লানা মাৎ।' তারপর ধাক্কা দিয়ে কাল্লুকে দরজার বাইরে ঠেলে দিলেন। মিঃ ঘোষ কাল্লুর হাতে হাতকড়া পরিয়ে তাকে ও ড্রাইভারকে নিয়ে ফিরে চললেন পুলিশ ভ্যানের দিকে।

রথীন মিত্র রিভলভারটা দৃঢ়হাতে ধরে খুব সতর্কভাবে অন্ধকার ঘরটা পেরোলেন। গোপন ঘরটা তিনি আগেই বাইরে থেকে দেখে রেখেছিলেন। অন্ধকারে দিক ঠিক করে গোপন ঘরে ওঠার সিঁড়ির কাছে এলেন। অন্ধকারে আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন। রাবার সোল-এর জুতো। কোনো শব্দ হলো না। দরজার কাছে এলেন। দেখলেন দরজা ভেজানো। তিনি এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন। ভজহরি ঘোষের নির্দেশে তখন মালপত্র সরাবার আয়োজন চলছে।

এক ধাক্কায় দরজাটা খুলেই লাফ দিয়ে ঘরে ঢুকলেন রথীন মিত্র। দুহাতে রিভলভার ধরলেন ভজহরির কপাল লক্ষ্য করে। বাঘের মতো গর্জে উঠলেন–'হ্যান্ডস্ আপ।' ঘরে বাজ পড়লেও বোধহয় ভজহরি আর রঙ্গরা এত অবাক হতো না। রঙ্গ, হরি সিং কাঠের বাক্স তিনটে সাজাচ্ছিল। ওরা বাক্স ছেড়ে দুহাত তুলে দাঁড়াল। একটু পরে ভজহরি ঘোষও দুহাত তুলল। একজন সশস্ত্র পুলিশ ঘরে ঢুকল। ছুটে গিয়ে প্রথমে ভজহরি ঘোষের প্যান্ট তল্লাশী করল হাত চেপে চেপে। কিছু নেই। তারপর কোটের তলা দিয়ে কোমরে হাত দিল। চামড়ার খাপে-ঢাকা পিস্তল হাতে ঠেকল। এক ঝটকায় পিস্তলটা বের করে নিল। পিস্তলটার বাঁট হাতির দাঁতে বাঁধানো। রঙ্গর কোমর থেকে বেরুলো ভাঁজ-করা ছোরা। হরি সিং-এর কাছে কিছু পাওয়া গেল না। সবাইকে পুলিশটি হাতকড়া পরিয়ে দিল।

রথীন মিত্র এতক্ষণে দুহাতে ধরা রিভলভার নামালেন। হেসে বললেন–'তারপর সদাশিব হাজরা ওরফে ভজহরি ঘোষ অবশেষে এখানে এসে ডেরা বেঁধেছো। আচ্ছা তোমার সদাশিব নামটা কে রেখেছিল হে ?'

সদাশিব চুপ করে রইল। রথীন মিত্র একই সুরে বললেন–'ব্যাঙ্ক ডাকাতি, নরহত্যা মানে তোমার বিরুদ্ধে এত অভিযোগ আছে যে তার ফিরিস্তি দিতে গেলে রাত কাবার হয়ে যাবে। বেশ কয়েকবার আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছো। আজকে একটি দুঃসাহসী বাচ্চা ছেলের সাহায্যে তোমাদের ধরতে পারলাম।' একটু থেমে বাঁ হাত বাড়িয়ে বললেন–'সদাশিব–দেয়াল আলমারীর চাবিটা দাও।'

–'ওখানে কিছু নেই।' সদাশিব বলল।

–'সে আমি বুঝবো। দাও।'

সদাশিব নড়ল না। রথীন মিত্র ক্রুদ্ধ হলেন। রিভলভারটা দিয়ে সদাশিবের মাথায় আঘাত করতে উদ্যত হলেন। চেঁচিয়ে বললেন–'চাবি দাও–নইলে–

সদাশিব বেশ ভয় পেয়ে গেল। রঙ্গকে ইশারা করল। রঙ্গ বলল–'সাব্–আমার বুকপকেটে।' রথীন মিত্র রঙ্গর বুকপকেট থেকে চাবি নিলেন। সঙ্গের পুলিশটিকে বললেন–সব ক'টাকে সোজা পুলিশ ভ্যানে তুলুন।' তারপর ওদের দিকে চেয়ে বললেন–'পালাবার চেষ্টা করে লাভ নেই। সমস্ত বাড়ি পুলিশ ঘিরে আছে।' তখনই সাতজন সশস্ত্র পুলিশ ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল। সদাশিব, রঙ্গ, হরি সিং ঘর থেকে বেরিয়ে এল। পুলিশরা ওদের ঘিরে নিয়ে চলল।

ওদিকে সাইকেলে চড়ে আসছে মোটু আর শান্ত। মোটুর সাইকেলের পেছনের কেরিয়ারে শেলী। ওরা 'মিত্রবাড়ি'র কাছাকাছি এসে দেখল চাঁদের আলোয় তিনটে পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ওরা সাইকেল চালিয়ে একটু এগোতেই একজন পুলিশ হাত বাড়িয়ে ওদের গতিরোধ করল। ওরা সাইকেল থেকে নামল। সেই পুলিশ অফিসার মিঃ ঘোষ এগিয়ে এলেন। বললেন–'তোমরা এখানে কী চাও ?' শান্ত বলল–'আমরা ত্রয়ী সত্যসন্ধানী।' অফিসার ঠিক বুঝলেন না। বললেন–'তোমরা কোথায় যেতে চাও ?'

–'মিত্রবাড়ি'তে। শেলী বলল।

অফিসার একটু আশ্চর্য হলেন। মোটু বলল–'স্যার, ইন্সপেক্টার রথীন মিত্র আমাদের খুব ভালোভাবেই চেনেন। পোড়োবাড়ির রহস্যের সমাধান আমরাই করেছিলাম। তারপর–'

এবার অফিসার মিঃ ঘোষ হাসলেন–'বুঝেছি বুঝেছি, তোমরা তিনজন ক্ষুদে ডিটেকটিভ। মিঃ মিত্র তোমাদের কথা আমাদের অনেকবার বলেছেন। তোমাদের মধ্যে 'মোটু' কে ?' তারপর মোটুর দিকে তাকিয়ে বললেন–'বোধহয় তুমি, তাই না ?' মোটু সলজ্জভাবে হাসল।–'দেখ–তোমাদের এখন যেতে দিতে পারবো না। দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকীদের এখনও ধরা হয়নি। বুঝতেই পারছো ওখানে যে কোনো মুহূর্তে গুলিগোলা চলতে পারে। অপারেশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের অপেক্ষা করতে হবে।' মিঃ ঘোষ বললেন।

ঠিক তখনই চাঁদের আলোয় দেখা গেল দূর থেকে কয়েকজন লোক 'মিত্রবাড়ি'র দিক থেকে আসছে। তাদের দুপাশে সশস্ত্র পুলিশের প্রহরা। ঐ লোকগুলো কাছে আসতেই মোটু চিনল–রঙ্গ, হরি সিং আর সেই সাদা রূপোলি চুল মাথায় সাহেবী পোশাক পরা লোকটা। মোটু ফিসফিস করে বলল–'শান্ত, শেলী–সামনে যে লোকটা আসছে, মাথার চুল সাদা–ওটাই হচ্ছে পালের গোদা। খুব সম্ভব ভজহরি ঘোষ। পরেরটি মোটা ঠোঁট–রঙ্গ। তার পেছনে হরি সিং। পরে সব বলবো তোদের।'

ভজহরি ঘোষদের পুলিশ ভ্যানে তোলা হলো। একজন পুলিশ মিঃ ঘোষের কাছে এগিয়ে এল। মৃদুস্বরে তাঁকে কী

বলল। মিঃ ঘোষ মাথা ঝাঁকালেন। মোটুদের কাছে এলেন। বললেন–'অপারেশন শেষ। গ্যাং-এর সব ক'টা ধরা পড়েছে। তোমরা এসো।'

অফিসারের পেছনে পেছনে তিনজন চলল। 'মিত্রবাড়ি'র সদর দরজা দিয়ে ওরা ভেতরে ঢুকল। মিঃ ঘোষ টর্চ জ্বাললেন। সবাই যখন গোপন ঘরের সামনে এল তখনই শান্ত টর্চের আলোয় দেখল–দরজার কাছে একটা বড় পেরেক আর একটা হাতুড়ি পড়ে আছে। ঐ দুটো দিয়ে রংগ লক্ ভেঙেছিল। ঘরের মধ্যে মাথা বাড়িয়ে মিঃ ঘোষ বললেন–'স্যার, সেই তিন বাচ্চা ডিটেকটিভ এসেছে।'

–'ভেতরে আসতে বলো।' রথীন মিত্র দেয়াল আলমারীটা খুলতে খুলতে বললেন।

মোটুরা ঘরে ঢুকল। রথীন বললেন–'এসো তোমরা। দেখ আমরা কীভাবে কাজ করি।' দেয়াল আলমারী খোলা হয়ে গেছে তখন। রথীন ভেতর থেকে ভি. আই. পি. সুটকেসটা বের করে টেবিলে রাখলেন। মোটুর দিকে চেয়ে বললেন–'তুমি নোটবইটা এই সুটকেসের ওপর পেয়েছিলে?'

–'হ্যাঁ।' মোটু ঘাড় নেড়ে বলল।

রংগর বুকপকেট থেকে নেওয়া চাবিটা দিয়ে রথীন মিত্র সুটকেসটা খুললেন। ডালা খুলতেই লণ্ঠনের আলোয় দেখা গেল থরে থরে নতুন ঝকঝকে একশ টাকার নোট সাজানো। রথীন মিত্র বললেন–'ঘোষ, লণ্ঠনটা কাছে আনো।' মিঃ ঘোষ লণ্ঠনটা নিয়ে রথীন মিত্রর কাছে গেলেন। রথীন মিত্র নোটের সারি ধরে গুনলেন। মনে মনে হিসেব করে বললেন–'ঘোষ, ঠিক তিন লাখ।' তারপর বুক পকেট থেকে সেই ছোট্ট পাতলা নোটবইটা বের করলেন। পাতা ওল্টালেন। নোটের সংগে বোধহয় নোটবইয়ে টোকা নম্বর মেলালেন–'ঘোষ, নৈহাটির স্টেট ব্যাংক ডাকাতি কবে হয়েছিল বলো তো?'

–'গত সেপ্টেম্বরে।' মিঃ ঘোষ বললেন।

–'তিন লক্ষ আটশ পঞ্চাশ টাকা ডাকাতি হয়েছিল। এটা সেই টাকা। আটশ পঞ্চাশ অবশ্য নেই।'

–'তাহলে সদাশিবের গ্যাংই এই ব্যাংক ডাকাতি করেছে?' মিঃ ঘোষ বললেন।

–'হুঁ। আর ডাকাতির টাকা রেখেছে এখানে।'

এবার রথীন মিত্র কেরোসিন কাঠের বাক্সগুলোর দিকে তাকালেন। লাল কালিতে বাক্স তিনটির গায়ে লেখা 'গ্লাস–হ্যান্ডেল উইথ কেয়ার' পড়লেন। বললেন–'ঘোষ, এই বাক্সগুলোতে কী আছে বলে তোমার মনে হয়?'

–'কাচটাচ মানে সামথিং ব্রেকেব্‌ল্–ভংগুর কিছু।' মিঃ ঘোষ বললেন।

রথীন মিত্র মাথা নাড়লেন–'উঁহু, কাচের মতো সস্তা জিনিসের কারবার করার লোক সদাশিব নয়।' শেলী বলে উঠল–'চিনেমাটির দামী কিছু থাকতে পারে।' রথীন শেলীর দিকে তাকালেন। বললেন–'চিনেমাটি বলছো কেন?'

–'আমাকে বাবা কিছুদিন আগে ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে নিয়ে গিয়েছিলেন। ওখানে দেখেছি চিনেমাটির একটা বড় ভাস্–ফুলদানি মতো। নিচে লেখা আছে, প্রায় পাঁচশো বছরের পুরোনো ঐ ভাস্‌টা চীনা সরকার ভারত সরকারকে উপহার হিসেবে দিয়েছে। তাহলে নিশ্চয়ই ওটা দামী জিনিস।'

–'ঠিক–ঠিক–' রথীন মিত্র মাথা ঝাঁকালেন–'সামথিং ভেরি ওল্ড–খুব দামী কিছু হতে পারে।' উনি সংগের পুলিশদের বললেন–'বাক্সগুলো খোলার ব্যবস্থা করুন।' তিন চারজন পুলিশ এগিয়ে এল। বাক্সগুলো দেখল। টিনের সরু পাত দিয়ে মোড়া। কোণাগুলো পেরেক পুঁতে আটকানো। পুলিশরা চারদিকে তাকাতে লাগল। কী দিয়ে পাত খোলা যায়! শান্ত একছুটে দরজার বাইরে এল। মেঝেয় পড়ে থাকা বড় পেরেক আর হাতুড়িটা নিয়ে এল। পুলিশরা ও দুটো পেয়ে খুশি হলো। হাতুড়ি ঠুকে পেরেকটা টিনের পাতের নিচ দিয়ে ঢোকাল। তারপর পেরেক দিয়ে চাড় দিতে লাগল। টিনের পাত খুলে আসতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা বাক্সের পাত খোলা হলো।

রথীন মিত্র বললেন–'সাবধানে ওপরের কাঠগুলো খুলুন।' কয়েকটা কাঠ খুলতেই দেখা গেল খড় পোরা। রথীন মিত্র খড় সরালেন। দেখা গেল একটা পাথরের মূর্তি। মূর্তিটা বের করে তিনি টেবিলে রাখলেন। দেখা গেল খুব প্রাচীন পাথরের সূর্যদেবের মূর্তি। অপূর্ব সুন্দর মূর্তির গায়ের অলংকারের সূক্ষ্ম কাজ। রথীন মিত্র মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললেন–'ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম থেকে তিনটে প্রাচীন পাথরের মূর্তি চুরি হয়েছিল। ঘটনাটা ঘটেছিল গত আগস্ট মাসে, খুব সম্ভব চৌঠা আগস্ট। অন্য দুটো বাক্সে বাকি মূর্তি দুটো রয়েছে। ও দুটো খোলার দরকার নেই।'

–'তাহলে এই চুরিও সদাশিবের গ্যাং-এর কাজ।' মিঃ ঘোষ বললেন।

মোটু,শেলী আর শান্তকে ফিসফিস করে বলল–'তপুমামা এইরকম পুরোনো মূর্তি চুরির ঘটনা আমাকে বলেছে। য়ুরোপ আমেরিকায় এইসব চোরাই মূর্তি নাকি লক্ষ লক্ষ টাকায় বিক্রী হয়।'

এবার রথীন মিত্র পুলিশের দিকে তাকালেন। বললেন–'আপনারা দুজন এখানে পাহারায় থাকুন। আমরা থানায় যাচ্ছি সব ব্যবস্থা করতে।'

প্রথমে রথীন মিত্র পরে মিঃ ঘোষ, তারপর মোটুরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। 'মিত্রবাড়ি'র বাইরে আসতে মোটু রথীনকে বলল–'স্যার, এই গুণ্ডাদলের আরো একটা লোক ভাঙা টেবিল চেয়ারের নিচে আটকা পড়ে আছে।'

–'বলো কি? কোথায়?' রথীন মিত্র জিজ্ঞেস করলেন।

–'আসুন এদিকে।' মোটু বলল।

সবাই পশ্চিম দিককার কাটা দরজার কাছে এল। কাটা দরজা হাঁ করে খোলা। মোটু বলল–'এই ঘরেই রয়েছে। কাটা দরজা দিয়ে ঢুকতে হবে।'

রথীন মিত্র কোমরের খাপ থেকে রিভলভার বার করলেন।

তারপর রিভলভার হাতে কাটা দরজা দিয়ে একটু কষ্ট করে ঢুকলেন। অন্ধকারে আবছা দেখলেন পুরোনো আসবাবপত্রের স্তূপ। রথীন কাটা দরজা দিয়ে হাত বাড়িয়ে বললেন–'ঘোষ, টর্চটা দাও।' মিঃ ঘোষ টর্চ দিলেন। রথীন মিত্র টর্চটা জ্বাললেন। টর্চের আলো ঘোরাচ্ছেন দেখছেন তখনই শুনলেন নাক ডাকার শব্দ। শব্দ লক্ষ্য করে টর্চের আলো ফেললেন। ভাঙা আসবাবপত্রের নিচে একজোড়া পা দেখা গেল। খাকি ফুলপ্যান্টের অংশ ও পায়ের বুট থেকেই বুঝলেন–পুলিশ। কিন্তু এখানে পুলিশ? ভাঙা টেবিল চেয়ারের ফাঁকফোকর দিয়ে ভালো করে নজর করতেই দেখলেন–ও হরি, এ যে বটেশ্বর! উনি এখানে থানায় এসে বটেশ্বরের খোঁজ করেছিলেন। ওকে পাননি। 'মিত্রবাড়ি'র রহস্য উদ্ধারের জন্যে তখন বটেশ্বর এইখানে হানা দিতে এসেছিল। রথীন মিত্র মৃদু হাসলেন। রিভলভার খাপে পুরলেন। দরজার ছিটকিনিটা খুললেন। দরজা খুলে গেল। রথীন মিত্র পুলিশদের বললেন–'ওপরের ভাঙা আসবাবপত্র সাবধানে সরিয়ে বটেশ্বরকে উদ্ধার করুন।'

কয়েকজন পুলিশ ঘরে ঢুকল। সাবধানে বটেশ্বরের ওপর থেকে আসবাবপত্র সরাতে লাগল। বটেশ্বরের ঘুম ভেঙে গেল। ওর নাক সুড়সুড় করে উঠল। প্রচন্ড জোরে হাঁচল–'হ্যাঁচ্ছো।' সব ভাঙা টেবিল চেয়ার সরাতে বটেশ্বর আস্তে আস্তে উঠে এল। মাথার টুপি ঠিক করল। সামনেই ইন্সপেক্টার রথীন মিত্রকে দেখে স্যালুট করল। বটেশ্বরের সারা গায়ে ধুলো বালি ঝুল লেগে আছে। মুখ শুকনো। গোঁফজোড়া যেন ঝুলে পড়েছে। রথীন মিত্র বটেশ্বরের য়ুনিফর্ম থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন–'বটেশ্বর, কোয়ার্টারে যাও। ঠান্ডা জলে চান করে বিশ্রাম নাও।' বটেশ্বর কী বলল। গলা দিয়ে ঘর্‌ঘর্‌ শব্দ বেরুল। কেশে নিয়ে অনেক কষ্টে বলল–'ছার–ছর্দি।' রথীন মিত্র বললেন–'বুঝেছি, তাহলে ঠান্ডা নয়, গরম জলে চান করো। পরে তোমার কাছ থেকে সব শুনবো।'

বটেশ্বর আর একবার স্যালুট করল। তারপর ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল।

বটেশ্বরের বিধ্বস্ত চেহারা দেখে মোটু-শান্ত-শেলীর পেট ফেটে হাসি এল। মোটু-শান্ত কোনোরকমে হাসি চাপল। কিন্তু শেলী পারল না। মুখ ফিরিয়ে মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসতে লাগল। বটেশ্বরের নজরে পড়ল সেটা। তিনজনের দিকেই তাকাল ও। তারপর নাক দিয়ে একটা শব্দ করল–'ঘোঁৎ।' আস্তে আস্তে হেঁটে চলল 'মিত্রবাড়ি'র দেউড়ির দিকে।

সকলে 'মিত্রবাড়ি'র সামনে এল। দেখা গেল লাল মারুতি গাড়িটার পাশে একটা পুলিশের জীপ গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। রথীন মিত্র মোটুদের দিকে তাকিয়ে বললেন–'জীপে চলো। তোমাদের পৌঁছে দি।' শান্ত বলল–'আমাদের সাইকেল আছে।'

ও হরি, এ যে বটেশ্বর!

–'তাহলে মোটু আমাদের গাড়িতে এসো। যেতে যেতে তোমার কাছে সব ঘটনা শুনবো।' লাল মারুতি ভ্যানটা দেখিয়ে মিঃ ঘোষ বললেন–'স্যার, সদাশিব এখানে ঐ ভ্যান চড়ে এসেছিল। যদি মূর্তির বাক্স সরাতে হয় সেইজন্যে।' রথীন ও মিঃ ঘোষ গাড়িতে উঠলেন। মোটুও উঠল। জীপ চলল।

শান্ত আর শেলী কিছুটা এগিয়ে এসে রাস্তার পাশে জিগা গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা সাইকেল দুটোর তালা খুলল। সাইকেলে উঠল দুজনে। জীপ গাড়ির পেছনে পেছনে যেতে লাগল। এদিকে গাড়িতে মোটুর সব কথা শুনে মিঃ ঘোষ মোটুর পিঠ চাপড়ে বললেন–'সাবাস্।'

'ত্রয়ী সত্যসন্ধানী'র অফিসঘরের সামনে এসে জীপ দাঁড়াল। শান্ত-শেলীও এসে পৌঁছল। মোটু দেখল বাবার বাইরের ঘর খোলা। আলো জ্বলছে। তাহলে বাবা-মা কলকাতা থেকে ফিরে এসেছেন। মোটু বলল–'স্যার একটা অনুরোধ।'

–'বলো।' রথীন বললেন।

–'গত রাতে বাড়ি ছিলাম না। বাবা জিজ্ঞেস করলে তো মিথ্যে বলতে পারবো না।' রথীন হাতঘড়ি দেখলেন। বললেন–'ঠিক আছে–তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলছি চলো।'

ঘরে বসে নকুলবাবু কী লিখছিলেন। ইন্সপেক্টার রথীন মিত্র ঢুকতেই মুখ তুলে তাকালেন। হেসে বললেন–'আরে ইন্সপেক্টার মিত্র। আসুন বসুন।'

–'এখন তাড়া, বসতে পারবো না। আপনার ছেলে মোটু থুড়ি জীমূতবাহন একা অসাধারণ সাহসের কাজ করেছে। কাল পরশুর মধ্যে এদিকে আসছি আপনাকে সব বলবো। অনুরোধ–আপনি কিন্তু জীমূতবাহনকে বকাঝকা করবেন না।'

–'ঠিক আছে–আপনি বলছেন যখন।' নকুলবাবু হেসে বললেন।

রথীন মিত্র এসে জীপে উঠলেন। জীপ চলল। পেছনে মোটুদের জয়ধ্বনি শুনলেন–'ত্রয়ী সত্যসন্ধানী কী জয়।' উনি মৃদু হাসলেন।

বাড়িতে ঢুকতেই সিঁড়ির গোড়ায় মা দাঁড়িয়ে। মোটুকে দেখে বললেন–'হ্যাঁরে, খেয়েদেয়ে কোথায় গিয়েছিলি?'

–'পুলিশ ইন্সপেক্টার রথীন মিত্র বাবাকে সব বলবেন।' মোটু বলল।

–'ও। ঠিক আছে–যা শুয়ে পড় তো। আর হ্যাঁ, শোবার ঘরে তোর ধুতি পাঞ্জাবি রেখেছি। দ্যাখ তোর পছন্দ হয় কিনা।' মা বললেন।

–'মা।' মোটু ডাকল।

–'বল।' মা বললেন।

–'বামুনদি'র ছেলেকে জামা-প্যান্ট দেবে তো?' মোটু বলল।

–'প্রত্যেক বছরই তো দি।' মা বললেন।

–'এবার ওকে ধুতি পাঞ্জাবি দাও। আমার মতো।'

–'কেন বল তো?' মা বললেন।

–'মা, বামুনদি আমাকে ভীষণ ভালোবাসে।' মোটু গভীর সুরে বলল।

–'ও এই কথা।' মা হেসে ফেললেন।

মোটু নিজের ঘরে এল। রাতের পোশাক পরল। মাথার এলোমেলো চুল আঁচড়াতে গিয়ে আয়নায় দেখল তখনও কপালে থুতনিতে কালচে রঙ লেগে আছে। ভাগ্যিস মার চোখে পড়েনি। তোয়ালে দিয়ে ঘষে ঘষে তুলে ফেলল দাগগুলো।

বিছানায় গিয়ে শুতেই মনে পড়ল কাল বাদে পরশু ষষ্ঠী। পুজো। বড় ক্লান্ত শরীর। যা গেছে শরীরের ওপর দিয়ে! একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের মধ্যে শুনল ঢাক বাজছে–ঢ্যাডাং-ঢ্যাং ঢ্যাং....ঢ্যাডাং-ঢ্যাং।

(শেষ)

ছবি: বিজন কর্মকার

দুষ্টু খুকুর দুষ্টুমি

অমলেন্দু সামুই

দুষ্টু হেসে,
খুকু এসে,
বলল শেষে
পাশে বসে,
'শুনবি দাদা,
একটা ধাঁধা?
পারিস যদি
তবেই পাবি
আমের আচার,
মিষ্টি খাবার।
বোকার মতো
কথা যত
বলিস যদি
ভেংচি পাবি।'

আমি বলি,
'শোনা, শুনি।
ধাঁধা আমি
ভালই জানি।
কঠিন যত
হবে তত,
জবাব দেব
শত শত।'

দুলে দুলে
খুকু বলে,
'চক্ষু দুটি
বুজিস যদি
তবেই তাকে
দেখা যাবে।
বল তো দাদা,
কি হয় সেটা?

শক্ত হয়ে
চোখ বুজিয়ে
একটু কেশে
মৃদু হেসে
এক কথাতেই
জবাবটি দেই,
'কি হয় আবার!
কালো আঁধার।'

ধরার আগে
পড়ল উঠে।
দৌড়ে গিয়ে
জানলা দিয়ে
হাসল খুকু,
বলল শুধু,
'জবাব ঠিক
সবই ঠিক।

কিন্তু দাদা,
সত্যি কথা,
হয়নি আনা
আচার খানা।
দিদার ঘরে
তাকের 'পরে
আমের আচার,
মিষ্টি খাবার,
জারে ভরে
যত্ন করে
রাখা আছে
বড়ির কাছে,
পাশাপাশি
হচ্ছে বাসি।

চাবি আছে
দাদুর কাছে।
নজর খানি
রাখছি আমি,
দুপর বেলা
দাদু-দিদা
বোজে যদি
চক্ষু দুটি,
চাবি খুলে
হাত বাড়িয়ে
আচার যত,
মিষ্টি তত
আনব পেড়ে
তোরই তরে।'

ছবি: সুফি

শিকারী থেকে সন্ন্যাসী

// প্রিয়রঞ্জন মৈত্র

রুণু-বিনুর মিষ্টিদাদু অর্থাৎ ওদের মায়ের জ্যাঠামশাই থাকেন হরিদ্বারের কাছে কংখলে। গুরুদেবের আশ্রমে। ভদ্রলোকের বয়স প্রায় আশি। বিয়ে থা করেননি। এক সময় শিকারী হিসাবে নাম ডাক ছিল। কাজ করতেন এক কাঠের কন্ট্রাক্টারের কাছে। সেই সূত্রে বন জঙ্গলে ঘুরেছেন। শিকার করেছেন। হঠাৎ সব ছেড়েছুড়ে দীক্ষা নিয়ে কেন যে সন্ন্যাসী হলেন তিনি, তা জানে না কেউ।

আশ্রমের কাজে মাঝে মাঝে তিনি যখন কলকাতায় আসেন তখন ওঠেন রুণু-বিনুদের বাড়িতে। তখন রুণু-বিনুদের বাড়িতে মাছ-মাংস আসে না। ঘরদোর বারবার ধোয়া মোছা করা হয়। ধূপ-ধুনোর গন্ধ, পূজা অর্চনা ইত্যাদিতে বাড়িটাকে কেমন যেন মন্দির মন্দির মনে হয় রুণু-বিনুর।

মিষ্টিদাদু খুবই স্নেহ করেন রুণু-বিনুকে। ওরা গল্প শুনতে ভালবাসে। তাই অনেক রকমের গল্প বলেন। বিশেষ করে সাধু-সন্ন্যাসীদের গল্প আর ভ্রমণের গল্প। বিভিন্ন ধরনের গল্প বললেও কখনো শিকারের গল্প বলেন না মিষ্টিদাদু। যতবারই তাঁকে শিকারের গল্প বলতে বলেছে রুণু-বিনু ততবারই এড়িয়ে গেছেন তিনি। এড়িয়ে গেছেন তাঁর সন্ন্যাসী হবার গল্পও।

তবে রুণু-বিনুর অতি আব্দারে গতবার বলেছিলেন, এরপর যখন আসব তখন সব বলব তোদের।

এবার কথায় কথায় সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছে রুণু-বিনু।

সেদিন সন্ধ্যার পর স্নান-আহ্নিক সেরে পাথরের গ্লাসে দুধহীন চা-য়ে চুমুক দিতে দিতে রুণু-বিনুকে কাছে ডাকলেন মিষ্টিদাদু।

চা খাওয়া শেষ হতে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। রুণু-বিনুর মনে হলো কী যেন ভাবছেন মিষ্টিদাদু। তাঁর মনটা চলে গেছে অনেক দূরে।

কোনো ভূমিকা না করে হঠাৎ মিষ্টিদাদু শুরু করলেন—তখন আমি একজন বড় টিম্বার মার্চেন্টের কাছে কাজ করি। যে সময়ের কথা বলছি সেই সময় জঙ্গলে কাঠ সংগ্রহ করা বেশ কঠিন কাজ ছিল। প্রায়ই লোকজনকে মরতে হতো বুনো জন্তু-জানোয়ারের হাতে। যদিও তখন শিকার-টিকারে তেমন বাধা ছিল না। জন্তু-জানোয়ারের হাত থেকে বাঁচার জন্য যেমন শিকার করা যেত তেমনি শুধু আনন্দফূর্তির জন্যও শিকার করা চলত।

সেবার দখনের বনে আমাদের কাঠ সংগ্রহ চলছে। মালিকের নির্দেশে আমি গেলাম ইন্‌স্‌পেকশনে। সঙ্গে আমার সব সময়ের সঙ্গী লেখু আর কুকুর ভুলো। লেখুর কথা একটু বলি। লেখু একজন আদিবাসী মানুষ। বয়সে আমার চাইতে কিছু বড়। একবার শিকারে গিয়ে ওর সঙ্গে পরিচয় হয় আমার। নিজের জীবন বিপন্ন করে পাগলা হাতির হাত থেকে যেভাবে আমাকে বাঁচিয়েছিল লেখু তা কল্পনা করলেও শরীর শিউরে ওঠে। তখন থেকেই লেখু আমার বন্ধু এবং সব সময়ের সঙ্গী। অমন দুর্ধর্ষ সাহসী মানুষ সচরাচর দেখা যায় না। যাই

হোক, বনে গিয়ে দেখলাম কাজ ঠিকমতোই হচ্ছে। দুদিন ওখানে থেকে তৃতীয় দিনের বিকেলে রওনা হবো ভেবে রেখেছি।

ফেরার দিন সকালে লেথু আর ভুলোকে সঙ্গে নিয়ে বেরুলাম ছোটখাট শিকারের সন্ধানে, খাবার মাংসের জন্য। আমরা যেখানে নৌকো বেঁধেছিলাম তার গায়ের বন তেমন গভীর ছিল না।

কিছুটা এগোতেই চোখে পড়ল ধূসর রঙের দুটো খরগোশ লাফাতে লাফাতে ঢুকে গেল হোগলা বনে। বনটা খোঁচাখুঁচি করেও আর দেখা মিলল না তাদের।

লেথু বলল, চলুন খাঁড়িতে যাই। পরশুদিন বালিহাঁস দেখেছিলাম ওখানে।

কিন্তু মন খারাপ হয়ে গেল খাঁড়িতে গিয়ে। খাঁড়ি একদম ফাঁকা।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ফেরার জন্য পা বাড়িয়েছি এমন সময় কয়েকটা সারস এসে নামল পুব দিকে কাদার ওপর। মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে বন্দুকটা তুলে নিয়ে ট্রিগার টিপলাম। পাখা ঝাপটিয়ে উড়ে গেল কয়েকটা সারস। কেউ বা ছুটে ঢুকে গেল কাছের কাশবনে।

চোখে পড়ল একটা সারস পড়ে রয়েছে কাদায়। ভুলো সারসটাকে তুলে আনার জন্য ছটফট করে উঠল। তাকাল আমার মুখের দিকে। অর্থাৎ আমার ইঙ্গিতের অপেক্ষা করছে সে।

তাকে ইঙ্গিত করার আগেই দেখলাম একটা সারস বেরিয়ে এসেছে কাশবন থেকে। সে গিয়ে দাঁড়াল মরা সারসটার কাছে। ঠোঁট দিয়ে তাকে টানাটানি করল কয়েকবার। তারপর তাকাল চারদিকে।

বন্দুকটা আবার তুলে নিয়ে নিশানা ঠিক করছি এমন সময় লেথু বলল, মনে হচ্ছে ওটা মরাটার জুড়ি।

লেথুর কথা ঠিক কিনা জানি না, দেখলাম মরা সারসটাকে ডানা দিয়ে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে অন্য সারসটা।

লেথু আর কিছু বলার আগেই গুলি করলাম ডানামেলা সারসটাকে। ভুলো দু'বার সাঁতরে গিয়ে মুখে করে নিয়ে এলো সারস দুটোকে।

লেথু ভাল মাংস রাঁধে। কিন্তু আশ্চর্য, মাংসপ্রিয় মানুষ আমি খেতে পারলাম না সেই মাংস।

লেথু বলল, জুড়ি মারাতে বোধহয় মন খারাপ লাগছে রাজাসাহেবের।

লেথু আমাকে রাজাসাহেব বলত।

আমি বললাম, তা নয়। শরীরটা ভাল লাগছে না।

লেথু আবার বলল, আমাদের দেশ গাঁয়ের লোকদের ধারণা জুড়ি মারলে নাকি শিকারীর ক্ষতি হয়। তাই জেনেশুনে কেউ জুড়ি মারে না।

লেথু প্রায়ই এই ধরনের কথা বলত। ডাইনী, বশীকরণ, বাণ-মারা—এইসব বিশ্বাস করত সে। আমি ওসবের মূল্য দিতাম না। সেদিনও দিলাম না।

দখনের বন থেকে ফেরার পর এক মাসের জন্য লেথু গেল তাদের গাঁয়ে। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই ফিরে এলো সে। ফিরে এলো তার মায়ের মৃত্যুসংবাদ নিয়ে। তার মাকে নাকি বাঘে খেয়েছে।

কী করে ব্যাপারটা ঘটল জানাতে গিয়ে সে একটা কাহিনী শোনাল। তাদের গ্রাম থেকে কিছু দূরে পশ্চিমে ময়াল নামে একটা গ্রাম আছে। সেই গ্রামের অবস্থাপন্ন মানুষ বরদাকান্তের শখ ছিল পশুপাখি পোষার। ভদ্রলোক ছিলেন বিপত্নীক। একমাত্র ছেলে নিয়েই ছিল তাঁর সংসার। বিভিন্ন জাতের পাখি, খরগোশ, সাপ, ভালুক, হরিণ এবং দুটো চিতা নিয়ে তিনি তাঁর বাড়িতে একটা মিনি চিড়িয়াখানার মতো তৈরি করেছিলেন। এক বছর আগে তাঁর ছেলে মারা যেতে তাঁর মাথার গোলমাল দেখা দিয়েছিল। কী যে খেয়াল হয়েছিল, একদিন তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন সব পাখিগুলোকে। আর অন্যান্য জন্তুদের বাড়ির কাছের বনটাতে। তারপর তিনি যে কোথায় চলে গিয়েছিলেন জানে না কেউ। তাঁর চিতাদুটোর লেজের অর্ধেকটা কাটা ছিল। গলায় ছিল সুদৃশ্য বকলশ। বয়স হয়েছিল ওদের।

চিতাদুটো একসঙ্গে বিভিন্ন গাঁয়ে হানা দিয়ে হাঁস-মুরগী-গরু-ছাগল এমন কি মানুষ মারতেও শুরু করেছিল। অনেক চেষ্টা করেও মারা যায়নি ওদের। কারণ চিতা দুটো এই আছে তো এই নেই। সব দেখেশুনে গাঁয়ের লোকদের ধারণা হয়েছিল ডানে (ডাইনী) পেয়েছে চিতা দুটোকে। ওদের হাতেই মারা পড়েছে লেথুর মা।

সব শুনে আমার কিন্তু মনে হয়েছিলো অনভ্যাসে এবং বয়সের কারণে জঙ্গলে শিকার করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল চিতাদুটো। তাই গ্রামে হানা দিয়ে সহজ শিকারে মেতেছিল।

সেদিনই স্থির করেছিলাম লেথুদের গ্রামে যাব চিতা শিকারে।

লেথু বলেছিল, ডানে পাওয়া জানোয়ার মারতে যাওয়া উচিত হবে না রাজাসাহেব। একে জুড়ি মেরেছেন—

সেদিনও লেথুর কথা গ্রাহ্য করিনি। বেরিয়ে পড়েছিলাম।

লেথুদের গ্রাম আমার পরিচিত। জঙ্গলের মধ্যে একটা ছোট টিলার ওপর ওদের গ্রাম। মাত্র কুড়ি পঁচিশটা ঘর নিয়ে গ্রামটা। বর্তমান সর্দারের এক পূর্বপুরুষ ছিল দুঃসাহসী মানুষ। সে-ই পত্তন করেছিল গ্রামটার। সে যখন পত্তন করেছিল তখন জঙ্গলে অনেক হিংস্র প্রাণী ছিল। পরে আর সে সব ছিল না। থাকার মধ্যে ছিল কিছু ভালুক, শুয়োর, হরিণ। মাঝে মধ্যে পাহাড় পেরিয়ে আসত হাতির দল। কদাচিৎ দু একটা নেকড়েও দেখা যেত।

সেবার মেল্ শিকারের সময় (চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন ভূমিজ, সাঁওতাল, শবর, মুন্ডারা মিলে যে শিকার উৎসব পালন করে) মারা পড়েছিল একটা নেকড়ে।

লেথুদের গ্রামে গিয়ে জেনেছিলাম ডান পাওয়া চিতাদুটোর হাত থেকে বাঁচার জন্য একজন বড় গুণিন ডেকে এনেছিল গ্রামের লোকরা। সেই গুণিন কয়েকদিন আগে ঝাড়ফুঁক করে গ্রামটাকে নাকি বেঁধে দিয়ে গেছে। তারপর থেকে নাকি এদিকে আসেনি চিতা দুটো।

যদিও গুণিন-টুনিনের ব্যাপারে আমার বিশ্বাস ছিল না, তবু দ্বিধায় পড়েছিলাম। তবে কি গুণিনের গুণে সত্যিই আর হানা দেবে না ওরা?

যেদিন লেথুদের গ্রামে পৌঁছেছিলাম তারপর দিনই সংবাদ এলো প্রায় দশ মাইল দূরের মুন্ডা গাঁয়ে আগের সন্ধ্যায় হানা দিয়েছিল চিতাদুটো। তবে সুবিধা করতে পারেনি। তাড়া খেয়ে পালিয়েছে।

খবরটা পেয়ে বুঝেছিলাম এবার অন্য গাঁয়ে হানা দেবে ওরা। হয়তো বা, লেথুদের গ্রামেও।

লেথুদের দুখানা চালাঘর। তার একটিতে থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল আমার। লেথুকে বলেছিলাম, আজ একটু সজাগ থাকিস। গত রাতে মুন্ডা গাঁয়ে যখন শিকার পায়নি তখন আজ এ গাঁয়ে আসতেও পারে। কারণ এখান থেকে ওরা বরাবরই শিকার পেয়ে গেছে। অন্য গাঁয়ে যে যাবে না, তা নয়। তবে এ গাঁয়ে আসার সম্ভাবনাই বেশি।

লেথুর চোখ-মুখ দেখে মনে হয়েছিলো আমার কথার তেমন গুরুত্ব দিল না সে। মনে হলো গুণিনের ওপর তখনো আস্থা রয়েছে তার। কিন্তু আমি যা ভেবেছিলাম তা-ই হলো। তবে একদিন পর।

সেদিন ডাইরি লেখা শেষ করে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। ঘুম ভেঙেছিল লোকজনের চেঁচামেচিতে।

বাইরে বেরিয়ে দেখি মশাল, টাঙি, তীর ধনুক হাতে হৈচৈ করছে অনেকে। লেথু জানাল কিছুক্ষণ আগে বাথরুম করতে যাবার সময় তাদের সর্দার লখিন্দর দেখে যে তার গোয়ালের ছিটে বেড়ায় বিরাট ফাঁক। তাড়াতাড়ি আলো নিয়ে গোয়ালে ঢোকে সে। গিয়ে দেখে তার একমাত্র গরুটি নেই। চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কিছু রক্ত।

ঘটনা শুনে মুহূর্তেই ভেবে নিয়েছিলাম মড়িটাকে যেখানে টেনে নিয়ে গেছে চিতাদুটো সেখান পর্যন্ত ধাওয়া করে যদি তাড়ানো যায় ওদের এবং মড়িটার যদি কিছু মাংস অবশিষ্ট থাকে তাহলে কাল হয়তো খাবার লোভে ওরা আসতেও পারে।

এই না ভেবে লেথু-লখিন্দরকে ডেকে আমার প্ল্যানটা বললাম। তারপর মশালের আলোয় রক্তের ফোঁটা লক্ষ্য করে এগোতে লাগলাম সকলকে নিয়ে। টিলার নিচে যেখানে ঝোরোর জল নেমে একটা চওড়া নালার মতো তৈরি করেছে সেখানে এসে থামলাম আমরা। বোঝা গেল মড়িটাকে টেনে ওপারে নিয়ে গেছে ওরা।

জল পেরিয়ে ওপারে কাদায় পায়ের থাবার চিহ্ন লক্ষ্য করলাম। লক্ষ্য করলাম মড়িটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাবার

ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে লেথুর ওপর।

দাগও। কিন্তু কিছুটা যাবার পরই সব চিহ্ন হারিয়ে গেল। খোঁজাখুঁজি করে শেষ পর্যন্ত মড়িটাকে পাওয়া গেল বিরাট এক পাথরের আড়ালে, ঝোপের মধ্যে। দেখা গেল মড়িটার সামান্য-কিছুটা মাংস খেয়েছে ওরা। লোকজনের চেঁচামেচি, মশালের আলো দেখে সরে পড়েছে তখনকার মতো।

মড়িটাকে ওখান থেকে সরিয়ে একটু ফাঁকা জায়গায় নিয়ে আসতে বললাম আমি। খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা দুটো শাল গাছে মাচা বাঁধতে বললাম।

সকাল থেকেই মাচা বাঁধার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল লেথু। নিজের জন্যও একটা মাচা করেছিল আমার মাচা থেকে পনের বিশ গজ দূরের ছোট পিটুলি গাছে। বারবার নিষেধ করেছিলাম আমি। স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম চিতারা গাছে উঠতে পটু। আমার মাচাতে আসতেও বলেছিলাম তাকে। কিন্তু কোনো কিছুতেই রাজী হয়নি সে।

সারাদিন মড়িটাকে পাহারায় রেখে সন্ধ্যার কিছু আগে টাঙি আর তীর ধনুক নিয়ে মাচায় উঠেছিল লেথু। আমি উঠেছিলাম টর্চ, জলের বোতল, বন্দুক নিয়ে।

মেঘ গর্জন করছিল অনেকক্ষণ ধরে। অসময়ের মেঘ। কিছুক্ষণ পর বৃষ্টি নেমেছিল। ভিজে জবজবে হয়ে গেছিলাম। তবু চুপচাপ বসেই ছিলাম। কারণ আমি নিশ্চিত ক্ষুধার্ত চিতাদুটো মড়িটাকে খেতে আসবেই।

বৃষ্টি চলেছিল অনেকক্ষণ। বৃষ্টি থামার পর পূর্ণিমা রাতের জ্যোৎস্নার ফিকে আলো যখন ছড়িয়ে পড়েছিল তখন দু'জনে

একত্রেই এসেছিলো ওরা। একটুও দেরি না করে খেতে শুরু করেছিল মড়িটাকে।

একটা আমার দিকে পেছন ফিরে খাচ্ছিল। অন্যটা লেথুর দিকে। একটু পাশ না ফিরলে গুলি করে লাভ হবে না ভেবে বন্দুকটা তুলে অপেক্ষা করতে লাগলাম। লেথুর সঙ্গে কথা হয়েছিল আমি গুলি না করা পর্যন্ত ও তীর ছুঁড়বে না।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই উঠে দাঁড়াল একটা চিতা। সম্ভবতঃ মড়িটার গা থেকে বড় একখন্ড মাংস ছিঁড়ে নিতে গিয়েই দাঁড়াল সে। আর দেরি করলাম না। ট্রিগার টিপলাম। কিন্তু আশ্চর্য! একই সঙ্গে দুটি চিতাই আর্তনাদ করে উঠল। একটা লাফিয়ে উঠেই পড়ে গেল মাটিতে। আর একটা অদৃশ্য হলো বনের মধ্যে।

একটু বাদেই মাটিতে পড়ে যাওয়া চিতাটা টলতে টলতে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা গুলি ছুঁড়লাম। আবার পড়ে গেল সে।

অনেকক্ষণ কেটে গেছিল। আর কোনো সাড়াশব্দ ছিল না। দূরে শেয়াল একসঙ্গে ডেকে উঠে রাত্রির প্রহর ঘোষণা করেছিল! আরো কিছু সময় বাদে লেথু চেঁচিয়ে বলেছিল, আমি নামছি গো রাজাসাহেব।

আমি বলেছিলাম, সকাল হলে নামিস।

লেথু বলেছিল, আমার তর সইছে না গো তবে যেটা ঘা খেয়ে পালিয়েছে সেটাকেও মেরে তবে কলকাতায় ফিরব–

বলতে বলতে মাচা থেকে নেমেছিল লেথু। এগিয়ে গেছিল মড়িটার দিকে।

টর্চের আলোটা ফেলে রেখেছিলাম মড়িটার ওপর।

আমিও নামব ভেবে ওয়াটার বট্‌ল থেকে একটু জল গলায় ঢেলে নিচ্ছি, হঠাৎ একটা গর্জন শুনে চমকে উঠেছিলাম। দেখেছিলাম ঘা খাওয়া চিতাটা কোথা থেকে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে লেথুর ওপর। লেথু লড়ছে চিতাটার সঙ্গে। দারুণভাবে আহত হয়েছে সে। আর দেরি করলে হয়তো ওকে শেষ করে ফেলবে চিতাটা। এখুনি গুলি করা দরকার।

কিন্তু যতবারই নিশানা ঠিক করে গুলি ছুঁড়তে চাইছিলাম ততবারই সামনে এসে যাচ্ছিল লেথু। একবার নিশানা স্থির করে গলি ছুঁড়তেই ভেসে এলো লেথুর আর্তনাদ। হকচকিয়ে গিয়ে দেখেছিলাম আমার গুলিতে জখম হয়েছে লেথু, চিতাটা নয়। এতক্ষণ ধরে যুজছিল সে, কিন্তু গুলির আঘাতে এবার নেতিয়ে পড়ল। আর সেই সুযোগে তার দেহটা মুখে নিয়ে ঝোপের মধ্যে ঢুকে গেল চিতাটা।

শরীরটা যেন অসাড় হয়ে গেছিল আমার। কী করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। ভেবে পাইনি কেমন করেই বা ঘটল ঘটনাটা? তবে কি সঙ্গীর হত্যাকারীকে খুন করবে বলে অপেক্ষা করছিল চিতাটা? অপেক্ষা করছিল তার আঘাতকারীর ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য?

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে গাছ থেকে নেমে প্রায় উদ্‌ভ্রান্তের মতোই এগিয়ে গিয়েছিলাম লেথুকে টেনে নিয়ে যাওয়া ঝোপের দিকে। তারপর কখন, কীভাবে যে চিতাটাকে গুলি করেছিলাম খেয়াল নেই। খেয়াল নেই কতক্ষণ লেথুর পাশে চুপচাপ বসেছিলাম। সকালে গ্রামের লোকেরা যখন হৈচৈ করতে করতে পৌঁছেছিলো তখনই যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়েছিলাম আমি।

ওরা লেথুর ক্ষতবিক্ষত দেহটা দেখেছিল। আমিও ঘটনাটা বলেছিলাম ওদের। সেদিনই লেথুর দেহ দাহ করে ফিরেছিলাম আমি। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আর কোনোদিন শিকার করব না। মাছ-মাংস ছোঁব না। কিন্তু সব সময় একটা অপরাধবোধ মনটাকে কুরে কুরে খেত। মনে হতো আমি যদি গুলি না করতাম তাহলে হয়তো লেথু চিতাটাকে মেরে বেঁচে যেতে পারত।

আমার মানসিক শান্তি গেল। পাগলের মতো এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতাম। লেথু বলেছিল জেনেশুনে জুড়ি মারলে নাকি শিকারীর ক্ষতি হয়। ও ঠিকই বলেছিল। ক্ষতি আমার হয়েছিল। মারাত্মক ক্ষতি। আমি নিজেকে একজন খুনী ভাবতে লাগলাম। শেষে আর সহ্য করতে না পেরে দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাসী হলাম। যদি ঈশ্বরের নামগান করলে শান্তি পাই, প্রায়শ্চিত্ত হয়।

একটানা কথা বলে থামলেন মিষ্টিদাদু, দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন দেয়ালে টাঙানো স্বামী বিবেকানন্দের ছবিটির দিকে।

ছবি: ধ্রুব রায়

জিজ্ঞাসা

প্রশ্ন ঃ

১। মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম কোথায় স্থাপিত হয়–মহীশূর, নিউ দিল্লী, মাদ্রাজ না হায়দ্রাবাদে ?

২। অফুরন্ত দানের জন্য কোন দাসবংশীয় সুলতানের নাম হয়েছিল 'লাখ বক্স' (যিনি লাখ টাকা দেন) ?

৩। দাক্ষিণাত্যের কোন নদীটির আরেক নাম 'বৃদ্ধগঙ্গা' ?

৪। সুভা কোথাকার রাজধানী–মরিসাস, ফিজি, মাল্টা না লাক্ষা দ্বীপ ?

৫। ইলেক্ট্রো কার্ডিওগ্রাফকে সংক্ষেপে আমরা কি বলি ?

৬। ভেনিসের মতোই ইওরোপের আরেকটি শহরে অজস্র ক্যানাল আছে। শহরটির নাম কি ?

৭। হায়দ্রাবাদের বিখ্যাত মিউজিয়ামটির নাম কি ?

৮। ফিল্যাটেলিস্ট কি সংগ্রহ করেন ?

৯। কোন দেশের খাবার সম্বন্ধে 'সুইট্ এ্যান্ড সাওয়ার' কথাটি প্রয়োগ করা হয় ?

১০। এ্যালেন কোয়াটারমেন, হেনরি কারটিস ও জন গুড কার খনি খুঁজে পেয়েছিলেন ?

উত্তর ঃ

১। হায়দ্রাবাদে

২। কুতুবউদ্দিন আইবেক।

৩। গোদাবরী। কারণ এর আয়তন ও বিস্তৃতি দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য নদীর তুলনায় অনেক বেশি।

৪। ফিজি দ্বীপ।

৫। ই. সি. জি.।

৬। আমস্টারডাম।

৭। সালারজঙ্গ মিউজিয়াম।

৮। ডাকটিকিট।

৯। চীন।

১০। রাজা সলোমানের।

ছবি ঃ রাহুল মজুমদার

এর আগে বিলি কখনো এমন হাল্কা মেজাজে খেলেনি

বিলির বুট

(৫১)

বিলি ডেন প্রাক্তন খেলোয়াড় ডেড সট কিনের একজোড়া ছেঁড়া বুট খুঁজে পেয়েছিলো। বুটটা পরে খেলেই বিলির খেলা একেবারে ডেড সটের মতো হয়ে যায়। ওদের স্কুলে ফুটবলের বদলে রাগবি খেলা আরম্ভ হতেই বিলি শহরের ইউথ ক্লাবে যোগ দিলো। বুটটা ছাড়া সে অতি সাধারণ খেলোয়াড়। তাই সে প্রথম দলে চান্স পেলো না। ক্যাপ্টেন হলো ছোটদের দলের। তারপর খেলতে নামলো ডেড সটের বুটটা পরে....

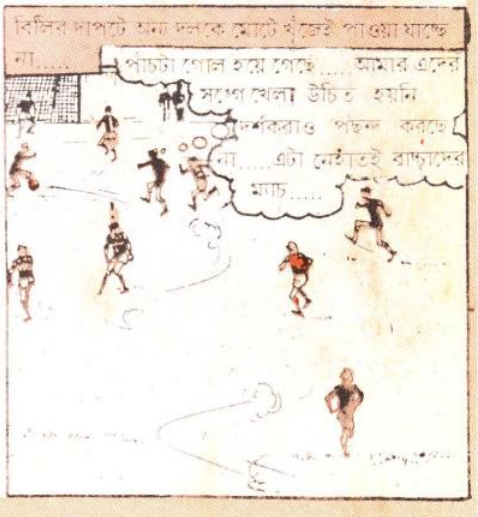

কিন্তু...
গো-ও-ল
ছটা হলো... অন্তত দশটা দিতে হবে!
ভালো লাগছে না..... খেলাটা শেষ হলে বাঁচি!
হঠাৎই একটা বিচ্ছিরি ঘটনা ঘটে গেলো.....
এটা কি হচ্ছে অ্যাঁ.....এই সব বাচ্চাদের সঙ্গে তুমি কেন খেলছো? তুমি তো ওদের কাউকে খেলতেই দিচ্ছো না!
এই রে..... উনি তো আমাকেই আক্রমণ করছেন!
ঐ ধেড়ে খোকাকে মাঠ থেকে বের করে দাও! বাচ্চাদের সঙ্গে ওর খেলার কোনো অধিকার নেই। আমার ছেলে রনি একটা কিক পর্যন্ত করতে পারেনি ঐ ছেলেটার জন্যেই.....
আমি কাউকে এমনি এমনি মাঠ থেকে বের করে দিতে পারি না ম্যাডাম। আপনি বরং মাঠ থেকে বেরিয়ে যান।
তুমি ছেলেটাকে মাঠ থেকে বের করে দেবে—না হলে আমি খেলা চালাতে দেবো না।
চিন্তা করবেন না স্যার...আমিই বেরিয়ে যাচ্ছি।
সেইটাই বোধহয় সব থেকে ভালো... তাই করো!
বিলি সাজঘরে ফিরে এলো...
আমায় মিছিমিছি বেরিয়ে আসতে হলো। আমার কি দোষ.....মিঃ লেটনই তো আমাকে তৃতীয় দলে খেলতে বাধ্য করেছেন.....
বিলি বেরিয়ে এসে খেলা দেখতে লাগলো.....
হুররে.....দারুণ রনি....
ওঁর ছেলে গোল দিলো.....৬–১... ভালোই হয়েছে।
সেদিন সন্ধেবেলায় হ্যানওয়ে ইউথ ক্লাবে বিলি আসতেই.....
প্রথম দলের খেলা ড্র হয়েছে ১–১। মনে হচ্ছে এবার ওরা তোকে প্রথম দলে খেলাবে।
তৃতীয় দল ৬–১ গোলে জিতেছে। একদম এলেবেলে খেলা!
মিঃ লেটন এলেন তখনই.....
মিঃ লেটন, আসছে সপ্তাহে বিলি নিশ্চয়ই প্রথম দলে খেলতে পারবে। আমাদের ওকে দরকার...
দুঃখিত। মনে হচ্ছে বিলি বোধহয় আমাদের কোনো দলেই আর খেলতে পারবে না!
বিলিকে মাঠ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। রেফারি তাঁর রিপোর্টেও তাই লিখেছেন। যতোদিন না এই ব্যাপারে এনকোয়ারি হচ্ছে ততোদিন তো বিলি খেলতে পারবে না!
খেলতে পারবো না... এনকোয়ারি হবে...আমি তো কিছু করিনি.....
এবার কি হবে? বিলি কি খেলতে পারবে না জানতে পারবে আসছে সংখ্যায়।

রক্তসরার দ্বীপ

রমেন দাস

॥ এক ॥

আধো আলো, আধো অন্ধকার। দু' চোখে ঘুমের কুয়াশা। জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। বৈঠা পড়ছে আর উঠছে, উঠছে আর পড়ছে। আধো ঘুম আর আধো জাগরণে ছেলেটা মায়ের কথা ভাবছিল। নদীর স্রোতের সুর, বৈঠার ছপছপ শব্দ। মনে হচ্ছিল যেন মার নরম গলায় ঘুমপাড়ানি গান। হঠাৎ ওর কান্না পেল। ভীষণ একটা কান্না যেন জোয়ার হয়ে ওর বুক ছাপিয়ে ওকে ভাসিয়ে নিতে চাইল। ধড়মড় করে উঠে বসল ছেলেটা। আর ঘুমঘুম চোখ মেলতেই দেখল তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে লোকটা।

কে এই লোকটা? ছেলেটা মনে করতে চেষ্টা করল। ওর সঙ্গে এই অচিন গাঙে এক নৌকায় কোথায় ভেসে চলেছি আমি? ও তো আমাদের দীঘিরপাড়, বোয়ালমারি কিংবা হিজলডাঙার মানুষ নয়। বড়দির শ্বশুরবাড়ি মনসাদীঘির কেউ কি? না, তাও তো নয়। তবে?

লোকটা এবার হাসল। ভয়ঙ্কর রুক্ষমুখের হাসিটা ভারি মিষ্টি। দেখলে মনে হয় এক মুখ দাড়ি গোঁফের জঙ্গলে যেন একটা পাঁচ ব্যাটারির টর্চ জ্বলছে।

এখনো ভাল করে আলো ফোটেনি। উঠে পড়লে কেন? কেমন মায়ামাখানো গলায় লোকটা বলল।

আমি অনেক ভোরে উঠি, ছেলেটা বলল।

ভাল, খুব ভাল। ভোরের সূর্য দেখলে শরীর সুস্থ থাকে, মন তাজা থাকে—তারিফ করার ভঙ্গিতে লোকটা বলল। তারপর কী যেন মনে হতে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল ছেলেটার দিকে, খিদে পেয়েছে?

ধেৎ—এই সাত সকালে কেউ আবার খায় নাকি? ছেলেটা হেসে ফেলল। বলল, কালকের রাতের সাবুকলা এখনো হজমই হয়নি।

নিজের মনেই লোকটা বলে উঠল, আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা পৌঁছে যাব।

পৌঁছে যাব! কোথায় পৌঁছে যাব—ভাবল ছেলেটি। এই অথৈ নদীর ঢেউয়ে মোচার খোলার মতো এক ডিঙি নৌকায় সম্পূর্ণ এক অচেনা, অজানা লোকের সঙ্গে ভাসতে ভাসতে কোথায় পৌঁছুবে সে!

আবার তার মায়ের কথা মনে পড়ল। কী হয়েছিল মার? শুধু কি মা? বাবাই বা কোথায় হারিয়ে গেল? মনে পড়ল কতগুলো অস্পষ্ট কথা। কিছু লোকের ফিসফিসানি। সব কথার মানে সে বোঝেনি। অদ্ভুত সব শব্দ। তবে কথাগুলো যে ভাল নয় ঐ কচি বয়সেও সে তা বুঝতে পেরেছিল। কৈশোরের সেই দোরগোড়ায় অদ্ভুত সব শব্দের ঝড়ের মধ্যেই একঝলক ঠাণ্ডা বাতাসের মতো এসে দাঁড়িয়েছিল এই লোকটা। হাসি মুখেই বলেছিল, আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে ওকে বরং আমি নিয়ে যাই।

প্রথমটায় সকলে হকচকিয়ে গিয়েছিল। বাপ-মরা মা-মরা কচি ছেলেটার কী গতি হবে। তারপর নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে সকলেই বলেছিল, সে তো খুব ভাল হয় ডাক্তারবাবু। ভদ্রঘরের ছেলে আপনার আশ্রয়ে থাকলে মানুষ হতে পারবে। আপনিই ওকে নিয়ে যান।

ডাক্তারবাবু! ছেলেটির এবার মনে পড়ল, তার সামনে বসা দাড়িচুলওয়ালা লোকটা তাহলে ডাক্তার। হ্যাঁ, ও-ই তো মাকে ওষুধ দিয়েছিল। লম্বা বোতল থেকে নুনজল মায়ের পায়ের শিরায় ছুঁচ দিয়ে ফুঁড়ে দিয়েছিল। তবু মা বাঁচেনি। মাকে নিয়ে যাবার ঘণ্টা পাঁচেকের মধ্যে বাবাকেও ওরা নিয়ে গিয়েছিল। তারপর দিনই এই ডাক্তারের হাত ধরে নৌকায় উঠেছিল ছেলেটি। মধ্যে একটা গঞ্জে নৌকা ভিড়িয়ে লোকটা একটা নতুন কোরা কাপড় কিনে দিয়েছিল। সঙ্গে একটা কুশাসন!

সেই নতুন কোরা কাপড় পরা আঁচল গায়ে জড়িয়ে বসা ছেলেটির এই ভোর বাতাসে এখন শীত-শীত করছে। লোকটা বোধহয় সব বুঝতে পারছে। হালকা রঙের একটা চাদর বের করে ছেলেটির গায়ে জড়িয়ে দিতে দিতে বলল, পশমের চাদর, ওতে দোষ নেই।

পশমের চাদরের উষ্ণতায় যেন মায়ের হাতের স্পর্শ। বাবাও কতদিন এমনি চাদর জড়িয়ে দিয়েছে গায়ে। দু'চোখ বেয়ে টপটপ করে জল ঝরে পড়ল ছেলেটির।

এই, এই ছেলেটা, কাঁদছ কেন? কান্নার কী হলো? আদরে ছেলেটিকে বুকে জড়িয়ে ধরল লোকটি। বলল, হ্যাঁরে—বাপ-মা কি কারোর চিরদিন বেঁচে থাকে? আমার বাপ মরেছেন আমার জন্মের আগে আর মা যখন চলে গেলেন, তখন আমি তোমার চেয়েও ছোট। ওরে বোকা ছেলে তোমার চোখের জলে ওদের যে কষ্ট হয়!

কষ্ট হয়? ছেলেটি জলভরা চোখ তুলে তাকাল। সামনে এক মুখ দাড়ি গোঁফের জঙ্গল। মুখে মিষ্টি হাসি অথচ চোখ জোড়া অমন চিক্‌চিক্ করছে কেন? কী আশ্চর্য, লোকটার চোখেও জল! আপনি কাঁদছেন কেন? নিজের কান্না ভুলে প্রশ্ন করে ছেলেটি।

কান্না একটা অদ্ভুত 'ইনফেকসাস ডিজিজ' বলল লোকটি। তারপর নিজেই বলল, ইনফেকসাস ডিজিজ মানে জানো?

জানি, ছেলেটি বলল, ছোঁয়াচে রোগ। স্বাস্থ্য বইতে পড়েছি।

সপ্রশংস দৃষ্টিতে লোকটি ছেলেটির দিকে তাকাল, বাঃ, ভেরি গুড়! তুমি স্কুলে পড়তে? কোন ক্লাসে?

এ বছর এইটে উঠেছি। ছেলেটি মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিল।

বাঃ বাঃ, লোকটি আরও একবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। তারপর দুহাত দিয়ে ওর আনত মুখটি উঁচু করে তুলে ধরে বলল, তোমার সঙ্গে ভাল করে আলাপই হলো না। ওরা পিকু পিকু বলে কী একটা নামে ডাকছিল তোমায়! তোমার নামটা কি বল দেখি?

আমার ডাকনাম পিকু, ছেলেটি বলল, ভাল নাম অভিমন্যু—অভিমন্যু মুখোপাধ্যায়।

তাহলে তোমার সঙ্গে আমার বাপ-বেটার সম্পর্ক। লোকটি হা-হা করে হেসে উঠল। বলল, আমার নাম কি জানো? অর্জুন বাঁড়ুজ্যে।

আবার হা-হা করে হাসি। তারপর ছেলেটির হাত ধরে ছইয়ের বাইরে এসে দাঁড়িয়ে আকাশের উত্তর কোণে ভোরের শুকতারার দিকে আঙুল তুলে বলল, ওই তারাটা চিনিস?

শুকতারা—ছেলেটি উত্তর দিল।

না, শুধুমাত্র শুকতারা নয়। ওটা তোর মা-বাবাও। তোর দিকে চেয়ে আছে। তুই বড় হবি, তোর নাম অভিমন্যু। দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা সপ্তরথীর মতো তোকে ঘিরে ধরবে। মহাভারতের অভিমন্যু হেরে গিয়েছিল। কিন্তু তোর হারলে চলবে না অভি। সব সময় মনে রাখবি, ঐ শুকতারার চোখে তোর মা-বাবা তোর দিকে চেয়ে আছে। আর তোর নতুন বাপ এই অর্জুন ডাক্তার তোর পাশে আছে।

একটা মন্ত্র-উচ্চারণের মতো অর্জুন ডাক্তারের গমগমে কণ্ঠস্বর নদীর জলের উপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে ওপারে মিলিয়ে গেল। মাঝি হাঁক দিয়ে উঠল, রায়দীঘি পৌঁছে গেলাম। নৌকা কি লঞ্চঘাটায় বাঁধব?

॥ দুই ॥

অঙ্ক পরীক্ষার খাতা জমা দিয়ে হলের বাইরে এসেই অভি দেখল অর্জুন ডাক্তার দাঁড়িয়ে।

কেমন হলো? ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'ভাল', বলেই অভি টুক করে ডাক্তার কাকুকে একটা প্রণাম করল।

পাগল ছেলে, বলে সস্নেহে অর্জুন ডাক্তার অভিকে বুকে টেনে নিলেন।

কাকু, পরীক্ষা তো শেষ, এবার সেই কথাটা মনে আছে তো? আবদারের সুর ফুটল অভির মুখে।

পরীক্ষা শেষ কীরে! হেসে উঠলেন অর্জুন ডাক্তার। সারা জীবন ধরেই তো চলে পরীক্ষা। সবে মাধ্যমিক দিলি। আরও কত পরীক্ষা দিতে হবে।

সে যখন দেবার তখন দেব, বলল অভি, এসব বলে আমাদের আসল প্রোগ্রামটা ধামাচাপা দেওয়া চলবে না কাকু।

ও-হ্যাঁ, কী যেন একটা কথা হয়েছিল বটে। মাথা নাড়লেন অর্জুন ডাক্তার। কিন্তু তার জন্য এত তাড়া কেন? কদিন একটু রেস্ট নে। তারপর দেখা যাবে।

আমার রেস্টের দরকার নেই কাকু। অভির গলায় অভিমানের সুর। এসব বলে তুমি প্রোগ্রামটা বন্ধ রাখতে চাইছ!

না রে বোকা ছেলে, আসলে এই মুহূর্তে একটা পড়াশোনার চাপ গেল। আবার এক্ষুণি হৈ হৈ করে বেরিয়ে পড়লে শরীর সইবে কেন? বললেন অর্জুন ডাক্তার।

বেশ আমি আর কোনওদিন তোমায় বেড়াতে যাওয়ার কথা বলব না। অভির মুখ গোমড়া হলো।

একনজর অভির দিকে তাকিয়ে উদাস কণ্ঠে অর্জুন ডাক্তার বললেন, ভাল কথা,তোর যখন ইচ্ছে নেই তখন তো কোনও ঝামেলাই রইল না। তের নম্বরের ঘোষ সাহেব নৌকা ঠিক করে একটা চিঠি দিয়েছেন। ওকে লিখে দিই এবার আমাদের ট্যুর বন্ধ!

তার মানে? লাফিয়ে উঠল অভি। ঘোষ সাহেব চিঠি দিয়েছেন? নৌকা ঠিক হয়েছে, কই এসব তো আমাকে আগে বলনি?

কী আর বলব? তোর যখন এত অনিচ্ছা–তেমনি উদাস-কৌতুকের সুর অর্জুন ডাক্তারের কণ্ঠে।

দেখ, ভাল হবে না বলছি কাকু। আমি সেই কতদিন থেকে দিন গুনছি, কবে সুন্দরবনের নদী-নালা, বন-জঙ্গল ঘুরে ঘুরে দেখব!

অমনি ছেলের রাগ হয়ে গেল। স্মিত মুখে বললেন অর্জুন ডাক্তার। আজ সোমবার। আগামী শনিবার হ্যামিলটন দ্বীপ থেকে আমরা রওনা হব। কটা দিন লাগবে না তোড়জোড় করতে?

টুক করে আরেকটা প্রণাম করে ফেলল অভি। বলল, কাকু তুমি ভীষণ মিস্টিরিয়াস।

কথাটা মিসচিভিয়াস নয় তো? প্রশ্ন করলেন অর্জুন ডাক্তার।

ধুৎ, মিসচিভিয়াস হবে কেন? বললাম মিস্টিরিয়াস, অপ্রতিভ ভঙ্গিতে বলল অভি। তারপর ব্যাখ্যা করল, মানে তুমি ভীষণ রহস্যময়।

রহস্যময়? হো হো করে হেসে উঠলেন অর্জুন ডাক্তার। এবার তা হলে এই রহস্যময় কাকুর সঙ্গেই তোর সুন্দরবনের রহস্যলোকে অ্যাডভেঞ্চার। আমাদের সঙ্গে কিন্তু বন্দুক-টন্দুক থাকবে না–আগেই বলে রাখছি।

যদি বাঘ আসে? কিশোর কণ্ঠে উদ্বেগ আর কৌতূহল মেশানো প্রশ্ন।

এলে কী আর করা যাবে! ডাক্তারের উদাস উত্তর।

বলো না কাকু, যদি বাঘ আসে–অভি আবার প্রশ্ন করে।

তোকে দেখা দেবার মতো অত বাঘ আর সুন্দরবনে নেইরে অভি। মানুষের অত্যাচারে প্রায় শেষ হয়ে আসছে সব। যদি তোর বরাত ভাল হয় তবে রিজার্ভ ফরেস্টে এক-আধটার দেখা পেলেও পেতে পারিস। আর সত্যি সত্যি যদি কপাল জোরে কোনও বাঘের দেখা পাস, বুঝতে পারবি কেন বাঘকে বনের রাজা বলে। কী ম্যাজেস্টিক, কী মহিমাময় চেহারা সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগারের।

বাঘ ছাড়া আর কি কি আছে কাকু? অধীর আগ্রহে জানতে চায় অভিমন্যু।

তোর মিস্টিরিয়াস কাকু আগেই সেই মিস্ট্রি জানিয়ে দেবে কেন? নিজের চোখে দেখবি বলেই তো আমাদের এই অভিযান।–আবার হেসে উঠলেন অর্জুন ডাক্তার।

অভির প্রশ্ন, আমরা কজন যাচ্ছি কাকু?

কজন আবার, আমরা দুই খুড়ো-ভাইপো, দুজন মাঝি, আর গঙ্গা নস্কর।

গঙ্গাদা? লাফিয়ে ওঠে অভি। গঙ্গাদাও যাবে? সত্যি বলছ কাকু?

যাবে বলেই তো মনে হয়। প্রায় দেড় মাস নদী-নালায় এই বুড়োর সঙ্গে ঘুরবি। কথা বলার একটা লোক পাবি না। তাই গঙ্গাকে লোভ দেখালাম। রাজীও হয়ে গেল। ভাবলাম, তোর সমবয়সী গঙ্গা সঙ্গী হলে তোর এই দীর্ঘযাত্রা আর একঘেয়ে লাগবে না। কিরে গঙ্গার কথা শুনে তোর ভাল লাগছে না?

ভাল লাগছে না মানে? দারুণ, দারুণ লাগছে কাকু। উচ্ছল আমোদে উজ্জ্বল হয়ে উঠল অভির মুখ। হঠাৎ কী ভেবে মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, আমার একটা কাজ করতে ইচ্ছে করছে কাকু, করব?

কি ইচ্ছে হলো আবার? প্রশ্ন করেন অর্জুন ডাক্তার।

তোমায় আবার একটা প্রণাম করব কাকু?

না, অত হুটহাট করে যাকে তাকে প্রণাম করতে নেই। গম্ভীর গলা অর্জুন ডাক্তারের।

যাকে তাকে? অবাক চোখে তাকাল অভি। বলল, তুমি আমার বাপ-মায়ের চেয়েও বড়। তোমাকে প্রণাম করা যাকে তাকে প্রণাম করা হলো?

কথাটা তুই ঠিক বলিসনি অভি। সংসারে বাপ-মায়ের চেয়ে কেউই বড় হতে পারে না। কে জানে ওঁরা বেঁচে থাকলে তোকে কিভাবে মানুষ করতেন। হয়তো আরও বড় হতিস তুই। আরও ভালভাবে থাকতিস। আমি তো কিছুই করতে পারিনি অভি।

তুমি কিছু করতে পারনি? তাহলে আমি মাধ্যমিক পরীক্ষা দিলাম কী করে। বাপ-মা-মরা সেই ছোট্ট ছেলেটা এত বড় হলো কি করে কাকু?

পাগল ছেলে। এসব কি আমার জন্যে? তোর নিজের জোরে তুই বড় হয়েছিস। সেই ছোটবেলায় তোকে বলেছিলাম না, তোর বাপ-মা ভোরের শুকতারা হয়ে তোর দিকে চেয়ে আছে?

একবার না, অনেকবার বলেছ কাকু। আমি সেকথা ভুলিনি।

না, ভুলবি না, এটাই তোর জোর। দূর থেকে কেউ চাইছে—তোর ভাল হোক, উন্নতি হোক, এটা মনে রাখলে দেখবি একদিন সত্য অর্থেই বড় হতে পারবি।

সেই কেউ একজন কে কাকু, ঈশ্বর—ভগবান?

ঈশ্বর, ভগবান, ওসব অনেক বড়সড় ব্যাপার। তোর ভগবান, তোর ঈশ্বর তোর বাপ-মা—শুধু এটুকুই মনে রাখিস।

আর তুমি, তুমি তবে কে? কৌতুকের ছটা অভির প্রশ্নে।

আমি, আমি আবার কে? বাদাবনের মানুষ বলে দুর্জন ডাক্তার। কোন কালে ডাক্তারি বইটই একটু নাড়াচাড়া করেছিলাম। তারই জোরে লোক ঠকিয়ে পেটের ভাত যোগাড় করছি।

তুমি লোক ঠকাও?

ঠকাই না? যে দেশে ওষুধে ভেজাল, ইনজেকশনে জল, চাইলে দরকারী ওষুধ মেলে না, লোকের একটা বড়ি কেনার পয়সা নেই—সে দেশে ডাক্তাররা লোক ঠকাবে না তো করবে কি?

আমি তো দেখেছি, তুমি কত লোককে বিনা পয়সায় ওষুধ দাও, পথ্যির জন্য টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য কর—এসব কী লোক ঠকানো?

লোকগুলো বড় অসহায় রে অভি! এটুকু না করে যে পারি না। অবশ্য আমি আর ক'দিন? বয়স বাড়ছে, কবে যে যন্ত্রটা ধর্মঘট করে বসবে আর অর্জুন ডাক্তারের পাগলা গারদে তালা ঝুলবে!

কেন, তালা ঝুলবে কেন?

ঝুলবে না? আমার মতো পাগল আর কে আছে যে ডাক্তারি পাস করে এই বাদাবনে এসে প্র্যাকটিস করবে?

যদি ভালভাবে পাস করতে পারি, আমায় ডাক্তারি পড়াবে কাকু?

হায়ার সেকেন্ডারিতে ভাল রেজাল্ট কর, আমি যদি বেঁচে থাকি নিশ্চয়ই পড়াব।

আমি ডাক্তার হয়ে তোমার ডিসপেনসারিতে এসে না বসা পর্যন্ত তোমাকে বেঁচে থাকতেই হবে।

এ তো এক ভীষণ শর্ত, পালন করতে যদি না পারি?

পারতেই হবে। বাবা-মার মতো দুম করে তুমি চলে যেতে পারবে না। তোমার ডিসপেনসারিতে আগে এসে আমি বসি, তারপর তোমার ছুটির কথা ভাবা যাবে।

এসব ভাবনা তোর মাথায় ঢোকাল কে?

কেন ঐ যে ভোরের শুকতারা? ওরা কি শুধু আমার দিকে

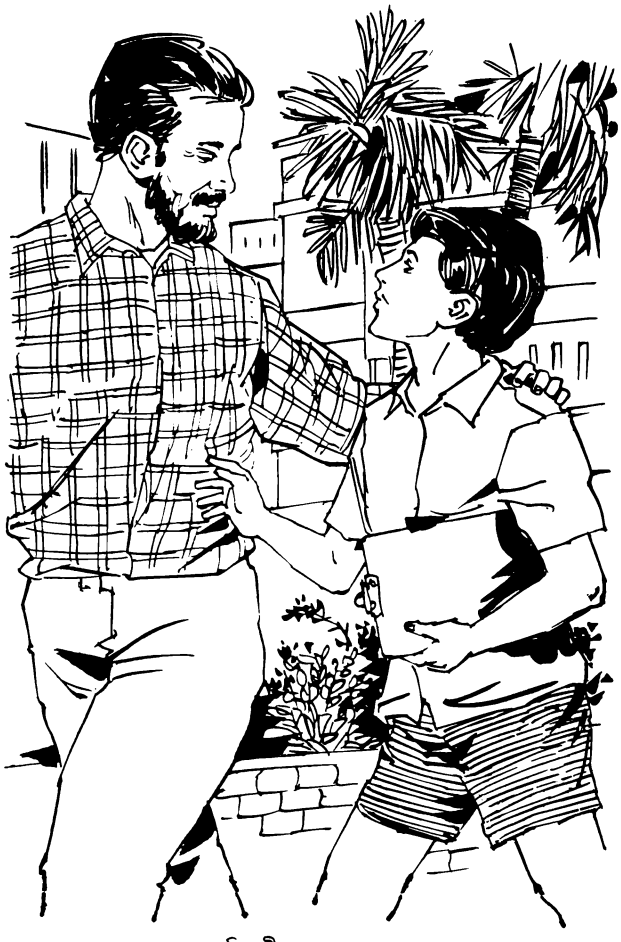

তুমি ভীষণ রহস্যময়।

তাকিয়েই থাকে নাকি? কথা বলে না ভাবছ? ওরাই তো বলেছে, তোর অর্জুন কাকার ভালবাসার ঋণ তোকে শুধতেই হবে! তুই শুধু আমাদের স্বপ্ন নস, তোর অর্জুন কাকারও স্বপ্ন।

অভিমন্যুর কথায় অর্জুন ডাক্তার চমকে উঠলেন। তাঁর সব ভাবনায় কেমন যেন ছেদ ঘটল। সবকিছু ভুলে অর্জুন ডাক্তার কিশোর অভিমন্যুকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আর তাঁর দুচোখের কোণ বেয়ে ঝরে পড়ল মুক্তোর মতো দু'ফোঁটা অশ্রুকণা।

(চলবে)

ছবি: বিজন কর্মকার

ওয়েটিংরুমে সেই রাত্রে

প্রভাস মল্লিক

গিরিডি লাইনের ছোট্ট শহর জগদীশপুর। তারকদার আমন্ত্রণে পুজোর ছুটি কাটাতে যখন কলকাতা থেকে রওনা হয়েছিলাম এই জগদীশপুরের দিকে তখন ভাবিনি জায়গাটা এত ভাল লাগবে। ঠিক ছিল এই ছুটিতে দক্ষিণ ভারত যাব। হঠাৎ সেটা ভেস্তে যাওয়ায় মন খারাপ হয়েছিল খুব। ঠিক সেই সময়েই আমার সহকর্মী তারকদা বললেন, 'আরে দক্ষিণ ভারত যাওয়া হচ্ছে না তো কী হয়েছে ! চলে এসো আমাদের জগদীশপুরে, খুব খারাপ লাগবে না।' একটু ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত আমন্ত্রণটা নিয়েই ফেলেছিলাম। আমার স্ত্রী রেণু প্রথমে আপত্তি করেছিল। কোথায় মদ্রাজ, তিরুপতি, কন্যাকুমারী, উতকামন্ড ! আর কোথায় জগদীশপুর !

জগদীশপুরে পৌঁছে কিন্তু আমাদের দুজনেরই মন জুড়িয়ে গেল। খুব সুন্দর জায়গা। দূরে দূরে ছোট ছোট পাহাড়। পাহাড়ের নিচে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাঁওতাল পল্লী। বাড়ির একটু পেছনেই শাল, পলাশ ও আমলকি গাছের ঘন জঙ্গল। তার কোল ঘেঁষে একটা পাহাড়ী নদী এঁকেবেঁকে চলে গেছে। খুব ভোরে উঠে মর্নিংওয়াকে বেরিয়ে পড়ি। আমার চেয়ে রেণুর উৎসাহই বেশি। আমাদের দেরি দেখলে সে একাই বেরিয়ে পড়ে।

দিন পনেরো বেশ কাটলো। মাঝে একদিন মধুপুর, একদিন দেওঘর ও একদিন গিরিডিতে উশ্রী ফলসও দেখে এলাম।

সেদিন আমাদের কোনো প্রোগ্রাম ছিল না। সকাল থেকেই মেঘ করে আছে। ঠান্ডা বেশ পড়েছে। খাওয়া-দাওয়া সেরে বসে আছি বাগানে–দেখি তারকদা কোথাও যাবার জন্য তৈরি হচ্ছেন। জিজ্ঞাসা করাতে বললেন তাঁকে নাকি যেতে হবে মহেশমুন্ডা। মহেশমুন্ডা জগদীশপুরের পরের স্টেশন। সেখানে একটা জমি কেনার ব্যাপারে কোনো লোকের সঙ্গে দেখা করতে হবে। সন্ধ্যার ট্রেনেই ফিরে আসবেন।

রেণু হঠাৎ বললে, 'চল না আমরাও ঘুরে আসি তারকবাবুর সঙ্গে, অবশ্য ওঁর যদি কোনো অসুবিধে না হয়।'

শুনে তারকদা বললেন, 'অসুবিধে কিসের ! চলুন তৈরি হয়ে নিন। এই তো মাইল আষ্টেকের পথ। বেশ জায়গা। আপনারা বেড়াবেন, সেই ফাঁকে আমি কাজ সেরে নেব।'

মহেশমুন্ডায় পৌঁছুনোর সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি শুরু হলো। তারকদা বললেন, 'তোমাদের বেড়ানো আর হয়ে উঠল না বোধহয়। আকাশের অবস্থা খারাপ। স্টেশনমাস্টার আমার চেনা লোক, ওকে বলে সেকেন্ড ক্লাস ওয়েটিংরুমটা খুলিয়ে দিচ্ছি। তোমরা ওখানেই অপেক্ষা কর। আমি কাজ সেরেই আসছি।'

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে তখন। বাইরে জল ঝড়ের মাতন চলছে তখনও। স্টেশনে জনপ্রাণী নেই। দূরে স্টেশনমাস্টারের ঘরে টিমটিম করে একটা আলো জ্বলছে। তারকদারও ফেরবার কোনো লক্ষণ দেখছি না।–'একটু চায়ের ব্যবস্থা করলে হয় না' বলে আমি উঠতে যাব রেণু বাধা দিল। এই অন্ধকার দুর্যোগে সে একা থাকতে পারবে না। অনেকক্ষণ থেকে বাতাসের সঙ্গে মাঝে মাঝে একটা কান্নার আওয়াজ যেন কানে ভেসে আসছিল। রেণু ফিস্‌ফিস্ করে বললে, 'একটা কান্নার

দরজার খিল খুলে দিল একটা লোক।

আওয়াজ শুনছ না?' আমি হেসে বললাম, 'ভয় পেলে নাকি? আরে বাবা বাঁশঝাড়ের ভেতর দিয়ে জোরে হাওয়া বইলে অমন কান্নার মতন শোনায়। তা ছাড়া শরৎবাবুর শ্রীকান্ত পড়নি? শকুনির বাচ্চারা ছোট শিশুদের মতো কাঁদে।'

রেণুর ভয় তবু গেল না। ও চেয়ারটা আমার চেয়ারের দিকে আরও টেনে নিয়ে এসে বসল।

রাত আটটার ট্রেনে আমাদের জগদীশপুর ফেরার কথা। এই ট্রেন ধরতে না পারলে সেই রাত এগারোটায় শেষ ট্রেন। তারকদার এখনও দেখা নেই। ওদিকে ঝড় একটু কমলেও বৃষ্টি মুষলধারে পড়ছে।

গাড়ির ঘণ্টা পড়ল। তারকদা না এলে আমাদের যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এদিকে ট্রেন এসে কয়েক মিনিটের জন্যে নিস্তব্ধতা ভেঙে দিয়ে পাড়ি দিল মধুপুরের দিকে। ট্রেন ছেড়ে দেবার পরই দেখি তারকদা হন্তদন্ত হয়ে আসছেন। সঙ্গে একজন লোক। তার হাতে এক চাঙ্গাড়ি খাবার ও একটা কেটলিতে চা।

তারকদা এসেই বললেন, 'গাড়িটা মিস হয়ে গেল। যা দুর্যোগ! লাস্ট ট্রেনেই বরং ফিরব। তোমাদের নিশ্চয় ক্ষিদে পেয়েছে। যা পাওয়া গেল নিয়ে এলাম। নাও হাত চালাও। এই ঠাণ্ডায় চা কতক্ষণ আর গরম থাকবে?'

চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললাম, 'তারকদা, রেণু খুব ঘাবড়ে গেছে বনের দিক থেকে কান্নার আওয়াজ শুনে।'

তারকদা দেখি গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, 'ভয় পাবারই কথা।'

আমাদের চায়ের পাট শেষ হয়ে গেছে। আবার চারিদিকে ঘন অন্ধকার। প্রবল বর্ষণের শব্দ শুধু কানে আসছে। হঠাৎ জঙ্গলের দিকে প্রচণ্ড শব্দে একটা বাজ পড়ল। বিদ্যুতের আলোয় দেখি তারকদা জঙ্গলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। তাঁর ভাবান্তর লক্ষ্য করে বললাম, 'কি তারকদা, তুমিও কি রেণুর মতো জঙ্গলের কান্না শুনছ।'

তারকদা বললেন, 'কান্না নয়, একটা অট্টহাসি যেন কানে এল। ঠিক যেমন এসেছিল আজ থেকে প্রায় বারো বছর আগে এই ওয়েটিংরুমেই।'

আমি বললাম, 'কোনো ভূতুড়ে ব্যাপার নাকি!' আমার কথা শুনে রেণু আঁতকে উঠল, 'কি যে অলক্ষুণে কথা বল তুমি!' দেখি ও চেয়ারটা আমার চেয়ারের আরও কাছে টেনে নিয়ে এসেছে।

তারকদাকে কখনও এত গম্ভীর হতে দেখিনি। বললেন, 'সেই রাতের কথা চিন্তা করলে আজও শিউরে উঠি। শুনবে সে কথা? তবে শোন। তারিখটা এখনও আমার মনে আছে—২৪শে ডিসেম্বর, বড়দিনের আগের দিন। কলকাতা থেকে বাবার ক'জন বন্ধু আসার কথা।আমি ও ছোটমামা

মহেশমুণ্ডায় এলাম কটা মুরগী কেনার জন্যে। ছোটমামা প্রায় আমার সমবয়সী। সঙ্গে বন্দুক এনেছিল জঙ্গলে পাখি কি বুনো মুরগী যদি পাওয়া যায়। এক ডজন মুরগী কিনে স্টেশনের পাশে ময়রার দোকানে রেখে আমরা যখন জঙ্গলে ঢুকলাম তখন তিনটে বেজে গেছে। সেদিনও সকাল থেকে মেঘ করেছিল। আমরা পায়ে পায়ে জঙ্গলের ভেতর অনেকটা এগিয়ে গেলাম। ছোটমামা দুটো তিতির পেয়েও মারতে পারল না। তখন তার রোখ চেপে গেল। ঘুরতে ঘুরতে একটু ফাঁকা জায়গায় আসতেই আমার নজর পড়ল পশ্চিম আকাশের দিকে। দেখি কালো মেঘ জমছে। ছোটমামাকে বললাম, 'ঝড় উঠতে পারে।' কিন্তু তখন আমার কথায় কান দেবার সময় নেই তার। একটা বুনো মুরগী দেখেছে ঝোপের মধ্যে। এদিকে অন্ধকার হয়ে আসছে। অগত্যা আমি তার হাত ধরে টেনেই নিয়ে চললাম।

দু এক ফোঁটা করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। দূরে পাহাড়ের কোলে ঝড় নেমেছে। আমরা ছুটছি কোনো আস্তানার খোঁজে। জঙ্গল থেকে তখনও বেরুতে পারিনি। দুজনেই ভিজে গিয়ে ঠান্ডায় কাঁপছি। স্টেশন কতদূরে কোন দিকে কিছুই ঠাহর করতে পারছি না। বিদ্যুতের আলোতে ডান দিকে একটা ভাঙা বাড়ি চোখে পড়ায় সেইদিকে ছুটলাম। দেখি সদর দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। জোরে জোরে কড়া নাড়তে লাগলাম। দরজায় ঘা দিতে লাগলাম। কোনো সাড়া নেই। ভাঙা বারান্দার নিচেও বৃষ্টির ছাট্ এসে পড়ছে। বড় রাগ হলো। দুজনেই দরজায় একসঙ্গে দিলাম ধাক্কা। মনে হলো ভেতরে কার পায়ের শব্দ। দরজার খিল খুলে দিল একটা লোক, সম্ভবতঃ বাড়ির মালী কি চাকর হবে। সর্বাঙ্গ তার ময়লা কাপড়ে ঢাকা। হাতে একটা লন্ঠন।

ছোটমামা চেঁচিয়ে বললে, 'কি করছিলে? কতক্ষণ ধরে ডাকছি দুজনে!'

লোকটার ক্ষীণ স্বর কানে এল, 'ওপরে চলুন, দেখবেন কি করছিলাম।'

রেগে গিয়ে ছোটমামা বললে, 'তাই চল।'

লোকটার পিছু পিছু ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলাম। সারা শরীর বেয়ে জল ঝরছে। রুমাল বার করে মুছছি, দেখি লোকটা বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে। খটকা লাগল। ছোটমামা বললে, 'লোকটা এত তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল কি করে?' বারান্দার শেষ প্রান্তে গিয়ে ও ডান দিকের একটা ঘরে ঢুকে গেল। আমরাও পা চালিয়ে বারান্দার শেষ মাথায় এলাম। কিন্তু দেখি সব অন্ধকার। গেল কোথায় লোকটা! হঠাৎ বিদ্যুতের আলোয় মনে হলো ডান দিকের ঘরটার দরজার একটা পাল্লা খোলা। এগিয়ে উঁকি মেরে দেখি ভেতরে ঘন অন্ধকার। আমার সঙ্গে একটা পেনসিল টর্চ ছিল, সেটা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে ঝাপটা মেরে আমাদের মাথার ওপর দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ক'টা বাদুড়। আচমকা ওদের ডানার ঝাপটা শুনে আমরা ভয়ে পেছিয়ে গেলাম। আর কোনো শব্দ নেই। কিছুক্ষণ একভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পর আস্তে আস্তে আবার এগিয়ে গিয়ে টর্চ ফেলে দেখি ঘরটা পুরনো ফার্নিচারে ভরা। আমি বেশ খানিকটা ঘরের মধ্যে ঢুকে গেছি, ছোটমামা দরজায় দাঁড়িয়ে। হঠাৎ আমার মাথায় কি যেন একটা ঠেকলো। আমি জোরে সেটা সরিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে আরও জোরে সেটা আমার মাথায় এসে আঘাত করলে। চকিতে পেছিয়ে এসে টর্চ ওপর দিকে ফেলতেই আমার সারা শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেল। দেখি সেই ময়লা কাপড় পরা লোকটা ওপরের কড়িকাঠের আংটা থেকে ঝুলছে। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে। কড়িকাঠের একটা আংটার সঙ্গে বাঁধা ওর শরীরটা এদিকে ওদিকে দুলছে আর ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ করছে জং ধরা আংটাটা। ছোটমামা তো আগেই বারান্দা ধরে ছুটতে শুরু করেছিল, আমিও টলতে টলতে পিছু নিলাম। কাছেই কোথাও একটা বাজ পড়ল। মনে হলো সারা বাড়িটা যেন কেঁপে উঠল। দরজা জানলা খড়খড়ি খটখট শব্দ করে নড়ে উঠল। কানে ঝুপ করে একটা আওয়াজ যেতেই বুকটা ধড়াস করে উঠল। চেয়ে দেখি ছোটমামা রেলিং ডিঙিয়ে নিচের উঠোনে লাফ মেরেছে। আমি যতটা পারি নিজেকে সংযত রাখবার চেষ্টা করলাম। এখন ভয় পেলে কি হবে কে জানে! সিঁড়ি বেয়ে কোনো রকমে নিচে নামলাম। দেয়ালে দু বার মাথা ঠুকে গেল। ছোটমামাকে তুলতে গিয়ে দেখি ও নিশ্চল পড়ে আছে। কোনোরকমে ওকে ধরে তুললাম। ঠকঠক করে কাঁপছে ভয়ে। তবে ভিজে বালির ওপর পড়েছে বলে বিশেষ লাগেনি। ওর হাত থেকে বন্দুকটা ছিটকে পড়ে গেছে কয়েক গজ দূরে। বন্দুকটা তুলে সদর দরজার দিকে যাব আবার প্রচন্ড শব্দ করে বাজ পড়ল। ছোটমামা পড়ে যাচ্ছিল চট করে ধরে ফেললাম ওকে।

সদর দরজার কাছে গিয়ে আমাদের চক্ষুস্থির। দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। আশ্চর্য, একটু আগেই তো লোকটা দরজা খুলে দেওয়ায় আমরা ভেতরে ঢুকেছি। কে আবার বন্ধ করলে! দমকা বাতাসের সঙ্গে আচমকা বাড়ির চারিদিক থেকে একটা অট্টহাসি ভেসে এসে আমাদের পাগল করে তুললে। ছোটমামা মরিয়া হয়ে উঠল। পায়ের মিলিটারি বুট দিয়ে সজোরে দরজায় আঘাত করলে। আমিও সমানে আঘাত করে চলেছি। পুরনো মোটা দরজা খুলতে চায় না। তখনও কানে ভেসে আসছে সেই অট্টহাসি। ছোটমামা শেষে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে দুবার আঘাত করাতে দরজার একটা পাল্লা ভেঙে পড়ল। আমরা ভাঙা পাল্লা গলিয়ে বেরিয়ে পড়েই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম। কেবলই মনে হচ্ছে সেই হাসি আমাদের তাড়া করে আসছে। কতক্ষণ ছুটেছি জানি না হঠাৎ দূরে ডিসট্যান্ট সিগনালের লাল আলো চোখে পড়ায়, সেই আলো লক্ষ্য করে যখন স্টেশনে পৌঁছলাম, তখন রাত্রি বারোটা বাজছে। তখনও বৃষ্টি পড়ে চলেছে। শেষ ট্রেন অনেক আগেই চলে গেছে। অগত্যা এই ওয়েটিংরুমের ইজিচেয়ারে দুজনে মড়ার মতো পড়ে রইলাম। অনেকক্ষণ বাদে একটা গোঙানি কানে যেতেই ঘোর কেটে গেল। মনে হলো ছোটমামা ঘুমের মধ্যে বকছে। কাছে উঠে গিয়ে ওর গায়ে

হাত দিয়ে দেখি ভীষণ গরম। কাঁপছে ও। মাঝে মাঝে কার নাম ধরে ডাকছে। সারা রাত জেগে কাটাতে হলো। ভোর বেলা জ্বর কমতে এক কুলির সাহায্যে ধরাধরি করে মধুপুরের ফার্স্ট ট্রেনে ওকে তুললাম। জগদীশপুরে পৌঁছে খানিকটা সুস্থ হলে মামাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি ঘুমের ঘোরে কার নাম ধরে ডাকছিলে।'

ছোটমামা বললে, 'কুলটিতে আমার সঙ্গে ফ্যাক্টরিতে কাজ করত অনিল উপাধ্যায়। একদিন আমার অসাবধানতার জন্যই ওর ডান হাতের তিনটে আঙুল মেসিনের মধ্যে পড়ে কেটে যায় আর ডান চোখটাও একটা রডে ধাক্কা লেগে প্রায় অন্ধ হয়ে যায়। কোম্পানী ওকে কিছু ক্ষতিপূরণ দেয় বটে তবে ওর চাকরি চলে যায়। ওর বড় দাদা মারা যাওয়াতে তার পরিবারের ভরণপোষণের ভারও অনিল নিয়েছিল। তাই চাকরি যাওয়াতে বেচারা খুব মুশকিলে পড়ে। প্রথম প্রথম সাহায্যের জন্যে আসতো ফ্যাক্টরিতে। আমরাও কিছু কিছু দিয়ে সাহায্য করতাম। পরে ও কোথায় চলে যায় আর কোনো খবর পাইনি।'

'আজ হঠাৎ তার কথা মনে পড়ল কেন তোমার?'

'কাল রাত্তিরে অনিল আমাকে টেনে নিয়ে যায় ঐ ভাঙা বাড়িতে। প্রথমটা বুঝতে পারিনি। যখন তোমার টর্চের আলো ওর চোখ দুটোর ওপর পড়ে তখন ওর ডান চোখ দেখে আমি শক্ খাওয়ার মতো চমকে উঠি। মনে পড়ে যায় যখন ও সিঁড়ি বেয়ে উঠছিল তখন দু আঙুল দিয়ে ধরা ছিল লণ্ঠনটা। সারা পথটা ওর অট্টহাসি আমায় অস্থির করে তোলে।'

এরপর ছোটমামা অনিলের দেশের বাড়িতে গিয়ে ওর ছেলে ও বৌকে খুঁজে বার করে। আর ছেলেকে ফ্যাক্টরিতে একটা চাকরি যোগাড় করে দেয়।'

তারকদার কথা শেষ হতে না হতেই গাড়ির ঘণ্টা পড়ল। বাইরের দিকে চেয়ে দেখি কখন বৃষ্টি থেমে গেছে। তারকদা বলল, 'চল তাড়াতাড়ি। গাড়ি এখুনি এসে পড়বে।'

ছবি : রাহুল মজুমদার

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো
ছোট বড় সকলের জন্য বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসার

এনসাইক্লোপিডিয়া

□ সমুদ্রের জল নোনা কেন □ লুচি ফোলে কেন □ হাউই কেন আকাশে ওঠে □ টিভির কাচ বাঁকা থাকে কেন □ পিঁপড়ে কেন সার বেঁধে চলে □ পরীক্ষার আগের রাতে পড়তে হয় কেন □ টুনটুনি পাখি কেমন করে চেনা যায় □ খাওয়ার পরে ঘুম পায় কেন □ তালগাছ কেন লম্বা হয় □

শুধু এই নয়, এইরকম কৌতূহল জাগিয়ে তোলা আরও হাজারো প্রশ্নের বিজ্ঞানসম্মত উত্তর দেওয়া হয়েছে বিজ্ঞানের ১৫টি স্বতন্ত্র শাখায়। উত্তর দিয়েছেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞ

পি.টি.এস. অফসেটে ছাপা বড় মাপের প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠার বই

রঙিন অফসেট প্রচ্ছদ

বিষয়সূচী

পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, ইলেকট্রনিক্স, বিদ্যুৎ, আবহবিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, সমুদ্র ভূ-বিজ্ঞান, শারীর বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, বিচিত্র পক্ষিজগৎ, বিচিত্র উদ্ভিদজগৎ ও বিচিত্র প্রশ্নমালা।

অরূপরতন ভট্টাচার্য সম্পাদিত

বিজ্ঞান যখন ভাবায়

লিখেছেন

অজয় হোম, অনীশ দেব, অমিত চক্রবর্তী, অরূপরতন ভট্টাচার্য, তরুণকুমার দাশ, দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থ সারথি চক্রবর্তী, প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য, ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল, মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়, রমাতোষ সরকার, রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, হরমোহন মুখোপাধ্যায়

□ দাম : ১০০ টাকা মাত্র □

নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

কয়লাখনিতে

বিজয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

শব্দটায় কেঁপে ওঠে অভি, ভয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে–'বাবা, কিসের শব্দ হলো? বোমা পড়ছে?'

শীতাংশুবাবু গেস্টহাউসের ব্যালকনিতে বসে কাগজ পড়ছিলেন। তিনিও চমকে উঠেছিলেন। যে শব্দে গেস্টহাউসের পুরো তিনতলা বাড়িটাই কেঁপে উঠল, সে শব্দে অভি তো ভয় পেতেই পারে।

শীতাংশুবাবু ছেলেকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললেন–'না, না। এখানে বোম পড়ে না বাবা।'

অভি কলকাতার ছেলে, তাই বোমের শব্দটা তার চেনা আছে। সে অবিশ্বাসের স্বরে বলে–'তাহলে ওটা কিসের শব্দ?'

–'ও তো ডিনামাইট চার্জ করা হচ্ছে। ঐ দেখ, ধোঁয়া উঠছে এখনও।'

অভি বাবার আঙুল অনুসরণ করে দেখল পাহাড়ের সারির পেছনে সত্যি ধোঁয়া। কোথাও আগুন লাগলে যেমন অনেকদূর থেকে ধোঁয়া দেখা যায়।

–'ডিনামাইট চার্জ?'

অভিজিৎ তার দশ বছরের জীবনে ব্যাটারী চার্জ বা লোডশেডিং কথা দুটোর মানে ভালই বোঝে। কিন্তু ডিনামাইট কথাটা সে একবারে উচ্চারণই করে উঠতে পারল না। সে বলল–'ডিনামাইট দিয়ে কি করা হয় বাবা?'

–'ঐ ডিনামাইট দিয়েই তো এখানে পাহাড়কে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।'

–'কেন?'

–'এখানে পাহাড়ের নিচে কয়লা আছে। পাহাড়ের মাটি পাথর না ভেঙে কি করে কয়লা বের করবে বল?'

অভি পাল্টা প্রশ্ন করল–'আচ্ছা কি করে বুঝবে কোন পাহাড়ের তলায় কয়লা আছে?'

–'বোঝা যায়। ভূতত্ত্ববিদরা বুঝতে পারেন। তাঁরা মাটি পরীক্ষা করেই বুঝতে পারেন কোন মাটির নিচে কোথায় কিসের খনি আছে। যেমন ডাক্তাররা মানুষকে পরীক্ষা করে বলতে পারেন তার কোনো অসুখ হয়েছে নাকি হয়নি।

কোনো পাহাড়ী অঞ্চলের ঠিক কোথায় কয়লা আছে জানা গেলে প্রথমে ডিনামাইট দিয়ে ওপরের মাটি পাথর ভেঙে সরিয়ে কয়লার স্তরের কাছে পৌঁছতে হয়। তারপর কয়লা কেটে তোলা হয়। এই ধরনের খনিকে বলা হয় 'ওপেন কাট' মাইন। এ যেন ঠিক একটা বিশাল পুকুরের মতো, যাতে জল নেই, যা শুধু কয়লায় ভরা।'

–'আমরা আজই কয়লার খনি দেখতে যাব বাবা।'

–'ঠিক আছে যেও।'

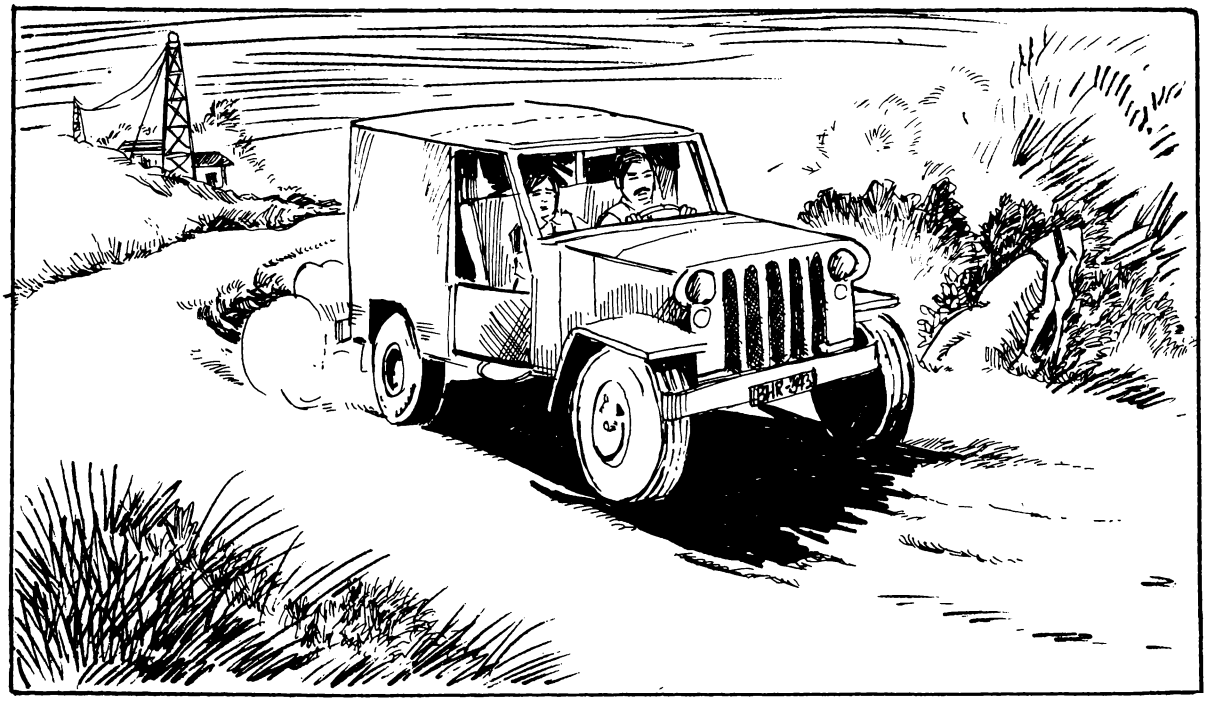

কথা বলতে বলতেই উঠে পড়েন শীতাংশুবাবু। তিনি কাকরী কোলিয়ারীর মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার। উত্তরপ্রদেশের এই কোলিয়ারীতে অফিস টাইম সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা, আবার বেলা ৩টা থেকে সন্ধ্যে ৬টা অবধি। বেলা ১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত দুপুরের খাওয়া আর বিশ্রামের জন্যে ছুটি।

শীতাংশুবাবু তাড়াতাড়ি স্নান সেরে জামা প্যান্ট পরে রেডি হয়ে গেস্টহাউসের ডাইনিং হলে গেলেন। সঙ্গে অভি আর তার মা। একসঙ্গেই ওরা সকালের জলখাবার খেল। বাবা জিপ গাড়ি করে চলে গেলেন কাকরীর প্রোডাকশন সেন্টারে। তিনি এতদিন এখানে কোয়ার্টার পাননি বলে অভিদের আনতে পারেননি। এখন কোয়ার্টার পেয়েছেন। তাই অভিদেরও নিয়ে এসেছেন। কোয়ার্টারে হোয়াইট ওয়াশ আর টুকিটাকি কাজ হচ্ছে। তাই কদিন গেস্টহাউসেই আছেন অভিদের নিয়ে।

বিকেলে সত্যি সত্যি অভিরা খাদ দেখতে গেল। ওর বাবা জিপ গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। অভির মা অভিকে গাঢ় নীল রঙের শার্ট, প্যান্ট পরতে বললেন, নিজেও একটা কালো রঙের জর্জেট পরে গাড়িতে উঠলেন। গাঢ় রঙের জামাকাপড়ে কয়লার ধুলো ফুটে উঠবে না জানা কথাই।

জিপ গাড়ি এঁকে বেঁকে চলেছে তো চলেইছে। পাহাড়ী রাস্তায় কোথাও গাড়িটা উঁচুতে উঠছে, কোথাও বা নিচুতে নামছে। বেশ মজা লাগছিল অভির। রাস্তার ডানদিকে কোথাও মাঠ, কোথাও বাগান, কোথাও বা দোকান, বাজার। একটা রেল লাইনও যেন কোথা থেকে কোথায় চলে গেছে। বাঁ দিকে শুধু পাহাড়। অভি পাহাড়কে এত কাছ থেকে আর কখনই দেখেনি। আশ্চর্য! এখানে পাহাড় তো কালো না, বরং সবুজ।

আসলে পাহাড়ের উপরে অনেক গাছ হয়েছে। সেই গাছই পাহাড়কে ঢেকে রেখেছে। সেই পাহাড়ের গায়ে আবার ছোট ছোট ঝুপড়ি। ওগুলো আদিবাসিদের আস্তানা। ওদের ছেলেমেয়েরা ঝুড়ি মাথায় নিয়ে কি যেন কুড়োচ্ছে। হয়তো কয়লাই কুড়োচ্ছে।

অভির খুব ইচ্ছে করছিল ওদের সঙ্গে আলাপ করে। কিন্তু উত্তরপ্রদেশীয় গাড়ির ড্রাইভার অভির ইচ্ছে বোঝে না। গাড়ি বাচ্চাদের পাড়া ছেড়ে একটা মাটির ঢিপির সামনে এসে পড়ে। ড্রাইভার বলে, 'ইধার মে কৈলা মিলা। ইস লিয়ে মিট্টি খোদাই হো রাহা হ্যায়।'

কিছুক্ষণ থেকেই অভির কানে একটা ঝনঝন শব্দ আসছিল। সে বুঝতে পারছিল না শব্দটা কিসের। কোথা থেকে আসছে? গাড়িটা বাঁক ঘুরতেই ও দেখল মাথার ওপরে তার ঝোলানো। সারি সারি লোহার বাক্স মতন কি যেন কতগুলো পরপর নিজেরাই লাইন করে তারে ঝুলতে ঝুলতে কোথায় যাচ্ছে, আবার কোথা থেকে ফিরেও আসছে। লোহার বাক্সগুলোর মাথায় যে চাকা লাগানো আছে সেই চাকা ঘুরছে।

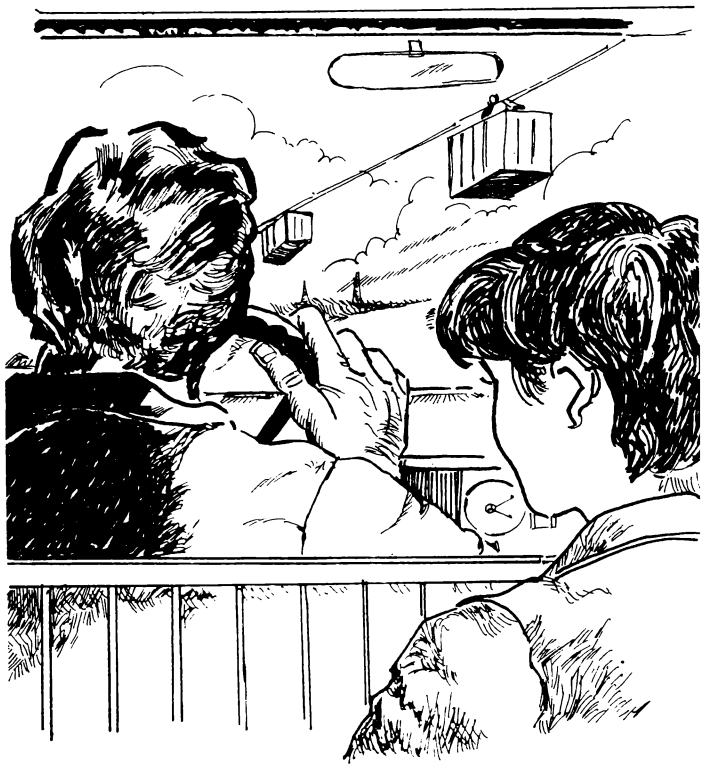

এগুলোকে রোপওয়ে বলে।

অভি কিছু বলার আগেই ওর মা বললেন–'ইয়ে কেয়া হ্যায়?'

ড্রাইভার হিন্দিতে যা বলল তাতে বোঝা গেল–একেই রোপওয়ে বলে। ঐ লোহার বাক্সগুলো ঝিংগুরদা কোলিয়ারী থেকে কয়লা ভরে নিয়ে রেণুসাগরের থার্মাল প্রোজেক্টে গিয়ে ঢেলে দিচ্ছে। সেখান থেকে খালি বাক্সগুলো আবার ফিরে চলে যাচ্ছে ঝিংগুরদায় কয়লা আনতে। ইলেক্ট্রিকের সাহায্যেই রোপওয়ে চলে।

অভিরা দেখল–সত্যি দু'লাইনে বাক্সগুলো যাওয়া আসা করছে।

অভির মা জিজ্ঞেস করলেন–'রেণুসাগর কিত্না দূর হ্যায়?'

ড্রাইভার বলল–'গাড়িমে আধা ঘণ্টা টাইম লাগতা হ্যায়। কম খরচমে কম মেহনতমে কৈলা লানেকে লিয়ে এহি সিস্টেম বানায়া গিয়া।'

অভি জিজ্ঞেস করল–'থার্মো প্রোজেক্ট ভি কিয়া এক কৈলা কা খাদান হ্যায়?'

মা বললেন–'না, না, ওখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়। ঐ বিদ্যুৎ তৈরি করতে কয়লা লাগে।'

অভিদের গাড়ি রোপওয়ের লাইন ধরেই যাচ্ছে। দেখতে

ধুলো কমানোর জন্যে।

দেখতে কয়লা খনির অফিসের সামনে এসে পড়ল গাড়িটা। শীতাংশুবাবু বাইরেই দাঁড়িয়েছিলেন ওদের জন্যে। তিনিও গাড়িতে উঠে বসলেন। অভি বাবার মাথায় একটা টুপি দেখল। ও জানে কয়লার ছোট ছোট চাঁই থেকে মাথা বাঁচানোর জন্যেই ঐ টুপি পরা।

গাড়িটা আবার চলতে শুরু করল। ঝাঁকানি খেতে খেতে ঘুরপাক দিয়ে গভীর করে কাটা খাদের ধার ধরে গাড়িটা নিচের দিকে নামতে লাগল। কোথাও আর পাকা রাস্তা নেই। আসলে কোনো রাস্তাই নেই। অনেকখানি চওড়া উঁচু নিচু জমি ভেঙে গাড়িটা টালমাটালের মতো ছুটছিল। ওদের গাড়িটার সামনে পেছনে আরও কতগুলো গাড়ি ভীষণ শব্দ করতে করতে চলেছে ধুলো আর ধোঁয়া ছড়াতে ছড়াতে। ওগুলোর এত শব্দ যে অভি বাবাকে কিছু জিজ্ঞেস করতেই পারছিল না। জিজ্ঞেস করলেও শোনা যাচ্ছিল না।

ওদের গাড়িটা হঠাৎ পাশ কাটিয়ে এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে গেল।

বাবা নেমে পড়লেন, ওদেরও নামতে বললেন। অভি লাফিয়ে নেমেই ভাবল সে খাদে নেমেছে। ওপর দিকে তাকিয়ে দেখল উপরের রাস্তা, কোলিয়ারীর অফিস সব কিছু অনেক উঁচুতে। সে যেন একতলায় দাঁড়িয়ে চারতলা, পাঁচতলা দেখছে।

বাবা বললেন–'ঐ দেখ, ওই মেসিনটার নাম শোভেল। ওটা মাটি কেটে ঐ লরির মতো জিনিসটায় ভরে দিচ্ছে। লরিটা মাল নিয়ে গিয়ে অন্য জায়গায় ঢেলে দিচ্ছে। আর ঐ যন্ত্রটার নাম ডাম্পার। কি বিরাট, কি উঁচু দেখেছ?'

'আচ্ছা বাবা, ওটা কি?'

–'ওই যন্ত্রটাকে বলে ডোজার। ঐ ডোজার দিয়েই কয়লার দেয়াল কেটে কেটে কয়লা বার করা হচ্ছে। সেই কয়লা ডাম্পারে ভর্তি করে নিয়ে গিয়ে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় জমা করা হচ্ছে

অভি অবাক হয়ে বলে–'দেখ মা, ডোজারগুলো ঠিক হাতির শুঁড়ের মতো। শুঁড়ের আগাটা দেখ কেমন ধারালো চিরুনির মতো।'

হঠাৎ একটা জোর হাওয়ায় কোলিয়ারীর সমস্ত কালিধুলো এসে ওদের সঙ্গে যেন রসিকতা করে গেল। ধুলোকালিতে দুনিয়াটা অন্ধকার হয়ে গেল। তারই মধ্যে একটা জোর গোঁ গোঁ শব্দে অভি ফিরে দেখল–একটা ডাম্পার মুখ দিয়ে যেমন ধোঁয়া ছড়াচ্ছে পেছন দিয়ে তেমনই জল ছড়াতে ছড়াতে চলে যাচ্ছে।

'বাবা, ঐ গাড়িটা জল ঢালছে কেন?'

–'ধুলো কমানোর জন্যে। ধুলোতে তোমাদের কষ্ট হচ্ছে তো, তাই ওরা জল ঢালছে।'

–'আচ্ছা বাবা, ঐ কয়লা বোঝাই ডাম্পার কোথায় যাচ্ছে?'

'ওপরের দিকে একটা জায়গায় কয়লা ঢেলে স্তূপ করছে। ওখান থেকে রোপওয়েতে যাচ্ছে মালগাড়ি বোঝাই করতে। মালগাড়িগুলো কয়লা নিয়ে নানা রাজ্যে বেরিয়ে যাচ্ছে। আসার সময় একটা রেললাইন দেখেছ না? ওটা কোলিয়ারীরই মালগাড়ির লাইন।

অভির হঠাৎ খেয়াল হলো ওরা একদম খাদে নামেনি। যেখান থেকে শোভেল মাটি কেটে ডাম্পারে ভরছে, সেখানেও কত লোক কাজ করছে। ওরা মাঝখানের একটা ঘোরালো চাতালে দাঁড়িয়ে নিচে কয়লা তোলা দেখছে।

অভি সঙ্গে সঙ্গে বায়না ধরল–'বাবা, আমি আরও নিচের খাদে যাব

–'আজ না বাবা, সন্ধ্যে হয়ে গেছে।'

ততক্ষণে খাদের মধ্যে আলো জ্বলে উঠেছে। অভির ফিরতে ইচ্ছা করছিল না একটুও। তাই বাবাকে জিজ্ঞেস করে–'কাল আবার আসব বাবা?'

মনে মনে ও ভাবে কাল সে প্রথমেই ঐ খাদের একদম নিচে নামার জন্যে বায়না ধরবে। সব ভাল করে দেখতে হবে। কলকাতায় গিয়ে বন্ধুদের কাছে সব গল্প করতে হবে তো।

ছবি: রাজা সরকার

বিজ্ঞানের খবর

সন্দীপ সেন

নোবেল একানব্বই

১৯৯১ সালের বিভিন্ন বিষয়ের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়ে গেছে। এশিয়া মহাদেশে একটি নোবেল পুরস্কার এসেছে। তবে সেটা বিজ্ঞানের কোনো বিষয়ে নয়। শান্তির জন্য নোবেল পেয়েছেন বার্মার জনগণের নির্বাচিত ও মিলিটারী শাসকের হাতে গৃহবন্দিনী নেত্রী আন সাঙ সু কি।

এবার দেখা যাক বিভিন্ন বিভাগে কে কে নোবেল পেলেন

পিয়ারে জিলেস দ জেনস।

পদার্থবিদ্যা

ফ্রান্সের বিজ্ঞানী প্রফেসর পিয়ারে জিলেস দ জেনস তরল কেলাস এবং পলিমার নিয়ে তাঁর উচ্চমানের গবেষণা ও সাফল্যের জন্য এ বছরের নোবেল পুরস্কার পেলেন। দ জেনস ১৯৩২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। দীর্ঘ ৩৫ বছর তিনি তরল কেলাস ও পলিমার নিয়ে গবেষণা করছেন।

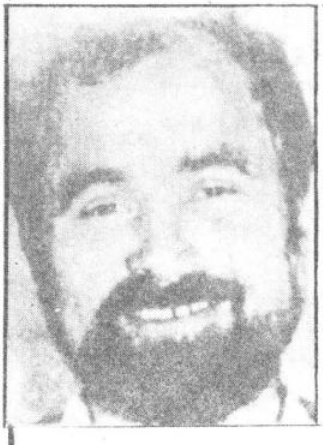

আরউইন নেহার

বার্ট স্যাকমান

শারীরতত্ত্ব এবং ঔষধ

শারীরতত্ত্বে নোবেল পেয়েছেন দু'জন জার্মান বিজ্ঞানী। তাঁরা হলেন আরউইন নেহার এবং বার্ট স্যাকমান। কোষের মধ্যে একক আয়ন চ্যানেলের কার্যপদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য তাঁরা পুরস্কৃত হন। তাঁরা কোষপর্দায় জমা হওয়া শ্লেষ্মা (Patch) পরিষ্কার করার পদ্ধতিরও আবিষ্কারক।

রিচার্ড আর্নস্ট

রসায়নবিদ্যা

এ বছর রসায়নবিদ্যায় নোবেল দেওয়া হলো নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স এর (NMR) পদ্ধতিগত উন্নতি করার জন্য। পেলেন সুইজারল্যান্ড জুরিখের ফেডারেল ইনসটিটিউট অফ টেকনোলজির অধ্যাপক রিচার্ড আর্নস্ট। রিচার্ড আর্নস্ট এমন এক ব্যক্তিত্ব যাঁকে আধুনিক NMR এর জনক বলা হয়।

রোনাল্ড কোয়াস

অর্থনীতিবিজ্ঞান

জন্মগতভাবে ব্রিটিশ এবং আমেরিকার চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক রোনাল্ড কোয়াস এবার অর্থবিজ্ঞানে নোবেল পেলেন। ১৯১০ সালে রোনাল্ড ইংলন্ডে জন্মগ্রহণ করেন। কোয়াস প্রথম আন্তর্জাতিক মুক্ত বাজার তত্ত্বের প্রবক্তা।

দাদুমণির চিঠি

শুকতারার বন্ধুরা,

ভালো আছো তো সকলে ?

নববর্ষের প্রীতি আর শুভেচ্ছা নাও। প্রার্থনা করি বছরটা যেন তোমাদের সব দিক দিয়েই ভালো যায়। পড়াশোনায়, খেলাধূলায় সব দিক দিয়ে যেন ভালো করতে পারো। প্রকৃতির রাজ্যে অনিয়ম বলে কিছু নেই। সবই কেমন নিয়ম মেনে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল দিয়ে চলে। কিন্তু প্রকৃতির শান্ত-স্নিগ্ধ রাজ্যে অশান্তির ঝড় এনে আমরাই সব এলোমেলো করে দিই। যেমন বোম্বাইয়ে এবার শীতটা বেশি পড়েছিলো। ভাবা যায় ফেব্রুয়ারি মাসের ২৪ তারিখে বোম্বাইয়ে ১৫ ডিগ্রি ঠান্ডা ! এমন কান্ড জন্মে শুনিনি বাবা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এ সবই ঐ গালফ ওয়ারের ফল। হবেও বা। আমরাই বা দায়ী কম কিসে ? গাছ-পালা কেটে, ফাঁকা জায়গায় ইট, চুন, সিমেন্ট আর লোহার খাঁচা বানিয়ে, কলকারখানা আর গাড়ির ধোঁয়া ছেড়ে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করে দিচ্ছি। মাটির তলায় পারমানবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছি আমরা। সুপারসনিক জেটের মতো বিমান, বাস কিংবা গাড়ির ইলেকট্রনিক হর্নও শব্দকে দূষিত করে তুলছে। প্রকৃতি আর কতো সহ্য করবে ? এর ফল আজ না হয় কাল আমাদের ভুগতেই হবে।

আমরা চিৎকার করে যাচ্ছি, তোমরা গাছ-টাছ লাগাচ্ছো কিন্তু যাঁদের হুঁশ ফেরার দরকার সবার আগে তাঁরা আজো বেহুঁশ। প্রকৃতির ওপর অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলেছে। প্রকৃতি তো বদলা নেবেই। আবহাওয়ার যে গোলমাল হচ্ছে তার কারণ তো এই। আর সেইজন্যেই আমি তোমাদের বারবার বলি, গাছ লাগাও, যত্ন করে সেই গাছটাকে বড় করে তোল। মনে রেখো, গাছের চেয়ে বড় বন্ধু আমাদের আর নেই। গত পুজো সংখ্যার শুকতারায় নারায়ণ সান্যালের 'গাছ-মা' পড়েছিলে তো ? আজ আমাদের সক্কলের এই বিষয়টা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করার সময় এসেছে।

আমাদের এক বন্ধু ভারী অদ্ভুত একটা প্রশ্ন করেছে। সে লিখেছে, কার কাছে যেন শুনেছে রামায়ণের সীতা আর মহাভারতের দ্রৌপদী নাকি একজনই। সীতা নাকি দ্রৌপদী নামে মর্তে এসেছিলেন ! ও জানতে চেয়েছে সীতা দ্রৌপদী একই কিনা।

পুরোপুরি না হলেও অনেকটা কিন্তু তাই। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে আছে, দেবতাদের ইচ্ছায় সীতা অগ্নির কাছে থেকে যান আর ছায়া সীতাকে রাবণ অপহরণ করে লংকায় নিয়ে যান। তারপর রাম-রাবণের যুদ্ধ। রাবণ বধ করে সীতাকে উদ্ধার করেন রামচন্দ্র। রাবণ বধের পরে সীতার অগ্নিপরীক্ষা হয়। অগ্নি আসল সীতাকে ফিরিয়ে দিলেন রামচন্দ্রের কাছে। ছায়া সীতার তাহলে কি হবে ? শ্রীরামচন্দ্র ও অগ্নির নির্দেশে ছায়া সীতা তখন পুষ্করতীর্থে গিয়ে তপস্যা শুরু করলেন। এই তপস্যার প্রভাবে ইনি রাজা দ্রুপদের যজ্ঞ থেকে উঠে এসে দ্রুপদ-কন্যা দ্রৌপদী নামে খ্যাত হন। তার মানে ছায়া সীতাই হচ্ছেন দ্রৌপদী।

বড় হয়ে পড়াশোনা করলে এই সব ব্যাপারে আরো অনেক কিছু জানতে পারবে। এই রকম একটা প্রশ্ন শুকতারার এক বন্ধুর মনে জেগেছে বলেই উত্তর দিলাম। রামায়ণ মহাভারত তো তোমরা সবাই জানো। যারা পড়োনি তারা নিশ্চয়ই টি. ভি-তে দেখেছো। এখন তোমরা নিশ্চয়ই ছোটদের রামায়ণ, ছোটদের মহাভারত পড়েছো। বড় হয়ে মূল বইগুলো পড়লে অনেক কিছু জানতে পারবে। বুঝতে পারবে, আমাদের সভ্যতা কতো পুরোনো। অনেকে অবশ্য বলেন, রামায়ণ মহাভারত সত্যি ঘটনা নয়, নেহাতই সাহিত্য। ও সব বিতর্কে না গিয়ে শুধু এইটুকুই বলা যায়—যে দেশে প্রাচীন কালে এমন সাহিত্য রচিত হয়েছিলো সেই দেশ তাহলে কতো উন্নত ছিলো। আমাদের কাছে সেইটাই তো বড় কথা। তোমরা কি বলো ? আমরা নিশ্চয়ই আমাদের অতীত সভ্যতা নিয়ে গর্ব করতে পারি।

সে যাই হোক। কেমন আছো সকলে ? গরমকালে ঘামে জবজব শরীরে কি বিচ্ছিরি লাগে তাই না ! কিন্তু তারপর যখন কালবৈশাখীর ঝড় আচমকা দৈত্যের মতো এসে চারদিক তছনছ করে দেবার সঙ্গে সঙ্গে রোদে পোড়া দিনটিকে স্নিগ্ধ করে তোলে তখন কি ভালোই না লাগে। তখন ফুরফুরে হাওয়ায় পাওয়া যায় হারিয়ে যাওয়া শীতের হিমের পরশ। প্রকৃতির এই খেলা একটু নজর করে দেখো। কতো কী যে শেখার আছে !

আজ তাহলে এই পর্যন্তই।

ভালো থেকো সকলে।

অনেক আদর আর ভালোবাসা নাও।

জয় হিন্দ।

তোমাদের দাদুমণি

তোমাদের পাতা

নববর্ষ

মাসের পর মাস পেরিয়ে
এল নববর্ষ।
সবার মুখে দেখা দিল
নববর্ষের হর্ষ।
নববর্ষ খুবই ভাল
খুবই খুশির দিন।
দ্বেষ-হিংসা ভুলে গিয়ে
নাচবে তা-ধিন-ধিন।

জ্যোতিপ্রসাদ সিংহ ঠাকুর,
বয়স দশ, ষষ্ঠ শ্রেণী,
বাঁকুড়া জেলা স্কুল

সুব্রত রায়, বয়স চোদ্দ, অষ্টম শ্রেণী,
উমাশশী হাই স্কুল, ব্যারাকপুর

গ্রামের কবিরাজ

গ্রামের কবিরাজ মশাই,
আনন্দরাম রায়।
যত বৃষ্টি রোদ হোক না
ছাতা দেন না মাথায়।
ভিজিট তো নেন না কিছু,
পান তামুক খান।
যে কোনো রোগ হলে
সবাই তাঁকে ডাকান।
হাসি তাঁর লেগে আছে,
বাঁকা ঠোঁটের আগায়।
পুঁথি তাঁর কেটে দিয়েছে
খুদে যত সব পোকায়।
ওষুধ তিনি তৈরি করেন
জড়ি-বুটি দিয়ে।
রোগীকে দেখেন তিনি
বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

অমিত দাস, বয়স পনেরো, দশম শ্রেণী,
এ. আর এন্ড টি কোম্পানি হাইস্কুল।
আসাম।

ভাস্কো-দা-গামা

ভাস্কো-দা-গামা,
গায়ে পরে না জামা,
বাজায় সারেগামা,
ভাই বলে থামা,
আসছে যে মামা,
মামা বলেন গামা,
বাজা তো ধামা?
আহা বেচারি গামা।

অলিঞ্জর ভৌমিক বয়স এগারো, পঞ্চম শ্রেণী, বালীগঞ্জ রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়।

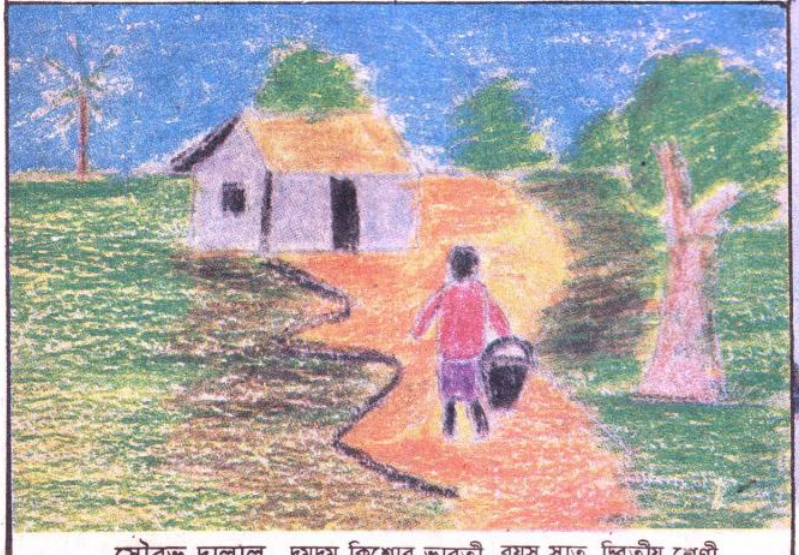

সৌরভ দালাল . দমদম কিশোর ভারতী, বয়স সাত, দ্বিতীয় শ্রেণী

শর্মিষ্ঠা মন্ডল, বয়স বারো, ষষ্ঠ শ্রেণী
বর্ধমান পৌর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, বর্ধমান

অনন্যা সরকার, বয়স তেরো, অষ্টম শ্রেণী,
আকবর রোড গার্লস হাইস্কুল, দুর্গাপুর।

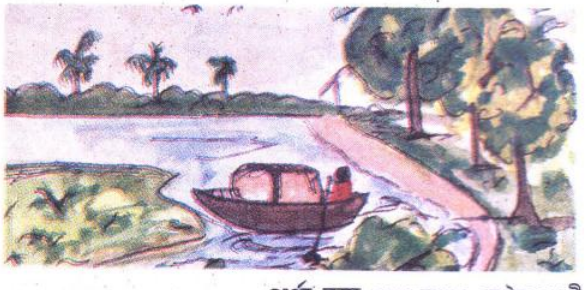

পর্ণা রায়, বয়স চোদ্দ, অষ্টম শ্রেণী
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বালিকা বিদ্যালয়, ডায়মন্ডহারবার

দাদুমণি তোমাকে

দিনগুলো সব পুরনো হয়, নতুন বছর আসে,
নতুন বছর আনবে আলো, তাই লোকে ভালোবাসে।
জীবনের যত ক্লেদ গ্লানি–জীবনের যত জ্বালা,
করবে দূর নতুন বছর–আনবে আশার মালা।
'শুকতারার' বন্ধু মোরা সেই মালা আজ পরে,
কেউ হবো কবি, কেউ বা লেখক, কেউ হবো ভবঘুরে।
ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার বাদে, যারা হতে চাও উকিল,
দাদুমণির নামে কেস কোর কোর্টে, এই করি শুধু দাখিল।
(শুকতারায়) বাবা বলে দাদু, আমি বলি দাদু,ভাইপোও বলে এক
তিনপুরুষের একই হয় দাদু, এ কেমন দেখ।
এ প্রশ্নের সমাধান, 'দাদুমণি করে দিও',
না হলে কেস করবো কোর্টে, তার দোষও তুমি নিও।
নববর্ষের নতুন দিনে, নাম চেঞ্জ কোর বলি,
কবিতাতেই দেবে উত্তর, প্রণাম নিও–চলি।

অনুপম ঘোষাল, বয়স আঠারো, বার্নপুর রোড, আসানসোল

বৃষ্টির দিনের গল্প

শ্যামলবাবু একটা কবিতা পড়ছিলেন। বৃষ্টির দিনে কবিতা পড়তে তিনি ভালবাসেন আর ভালো কবিতা হলে তিনি সেটা ছেলে কানুকে শোনাতে ভালবাসেন। তাই তিনি কানুকে ডাকলেন। কানুর বদলে উত্তর দিলেন কানুর মা, ও বাইরে গেছে একটু বৃষ্টির জল গায়ে লাগাবে বলে। কিন্তু অনেকক্ষণ হয়ে গেল, এখনও ফিরছে না কেন? তিনি বাড়ির ভৃত্য রাসুকে পাঠালেন কানুকে খুঁজে আনার জন্য। রাসু অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা ছাতা মাথায় বেরিয়ে গেল।

বাড়িতে যাকে নিয়ে এত হৈচৈ পড়ে গেছে, সেই কানু তখন মাঠের ধারে বসে বসে ভিজছে এবং ভাবছে মায়ের বকুনির কথাগুলি। মা আজ তাকে পড়তে না বসার জন্য খুব বকেছেন। কানুর তাই অভিমান হয়েছে। কানু বলেছিল মা, আজকে আর পড়তে ভালো লাগছে না। মা তাই খুব বকেছিলেন। কানু ভাবে, আচ্ছা এই বর্ষার দিনে কারো পড়তে ভালো লাগে? তাই রাগ করে ও চলে এসেছে এই মাঠের ধারে। হঠাৎ দেখলো একটা পাখির বাচ্চা মাঠে বৃষ্টির জলের স্রোতের মধ্যে পড়ে গেছে। বাচ্চাটার মা তাদের ভাষায় চিৎকার জুড়ে দিয়েছে। কানু দেখলো, পাখির বাচ্চাটা স্রোতের টানে একটা গর্তের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। পড়লেই তার মৃত্যু অবধারিত। কানুর মাথার ভিতরে তড়িৎ খেলে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে ও পাখির বাচ্চাটাকে তার আসন্ন মৃত্যু থেকে রক্ষা করলো। কিন্তু তাকে কোথায় রাখবে কানু? ও দেখলো বাচ্চাটার পাখি-মা একটা বাসার দিকে উড়ে যাচ্ছে। কানু বুঝতে পারলো। বাচ্চাটাকে নিয়ে সেই গাছের উপরে উঠে সাবধানে বাসায় রেখে দিল। গাছ থেকে নেমেই কানু দেখলো বাচ্চাটার মা তাকে ডানার তলায় রেখে গরম করতে লাগলো ভালোবাসার সঙ্গে। কানুর ওর মায়ের কথা মনে পড়লো। মনে হলো, মা তো ওর জন্যও এমনই চিন্তা করছেন এতক্ষণে। সেই যে মিথ্যে কথা বলে বেরিয়েছিল, তারপর অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। মা নিশ্চয়ই এতক্ষণে হৈচৈ জুড়ে দিয়েছেন। কানু ছুটলো বাড়ির দিকে। কানুর সব রাগ, অভিমান মুছে গেল এই বৃষ্টির দিনে ওই মা-পাখিটার মমতার স্পর্শে।

মুনমুন সরকার, বয়স পনেরো, দশম শ্রেণী,
বঙ্গবাসী বালিকা বিদ্যালয়, নবদ্বীপ।

শান্তশ্রী সাহা, বয়স আট, তৃতীয় শ্রেণী,
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়।

বাহাদুর বেড়াল

দলকে ভালিম দেওয়ার জন্যে আমি এখন খুবই ব্যস্ত।
ইঁয়োফ্‌স্‌!
ফাউল!
আমার জন্যে আবার আর একটা কাজ।
তোমাকে হলুদ কার্ড দেখানো হলো!
খেলা শেষে
তুমি একটা খুব ভালো কাজ করেছো
বাহাদুর। আমি পশুর ডাক্তার তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে?
নিশ্চয়!
কুকুরের হাসপাতাল
এই যে, এসে গেছি, বাহাদুর!
কুকুরের আস্তানা! এটা দেখা আমি পছন্দ করি না!
এতো কুকুরের মধ্যে সবাই অসুস্থ নয় কিন্তু কুঁড়ে, তাই আমি জানতে চাই সেগুলি কারা।
মরেচে! ওঁকৎ!
চমৎকার! এখন আমি দেখতে পাচ্ছি কোন কুকুর সুস্থ আর কে নয়!
বাঁচাও!
ঘেউ
ঘেউ

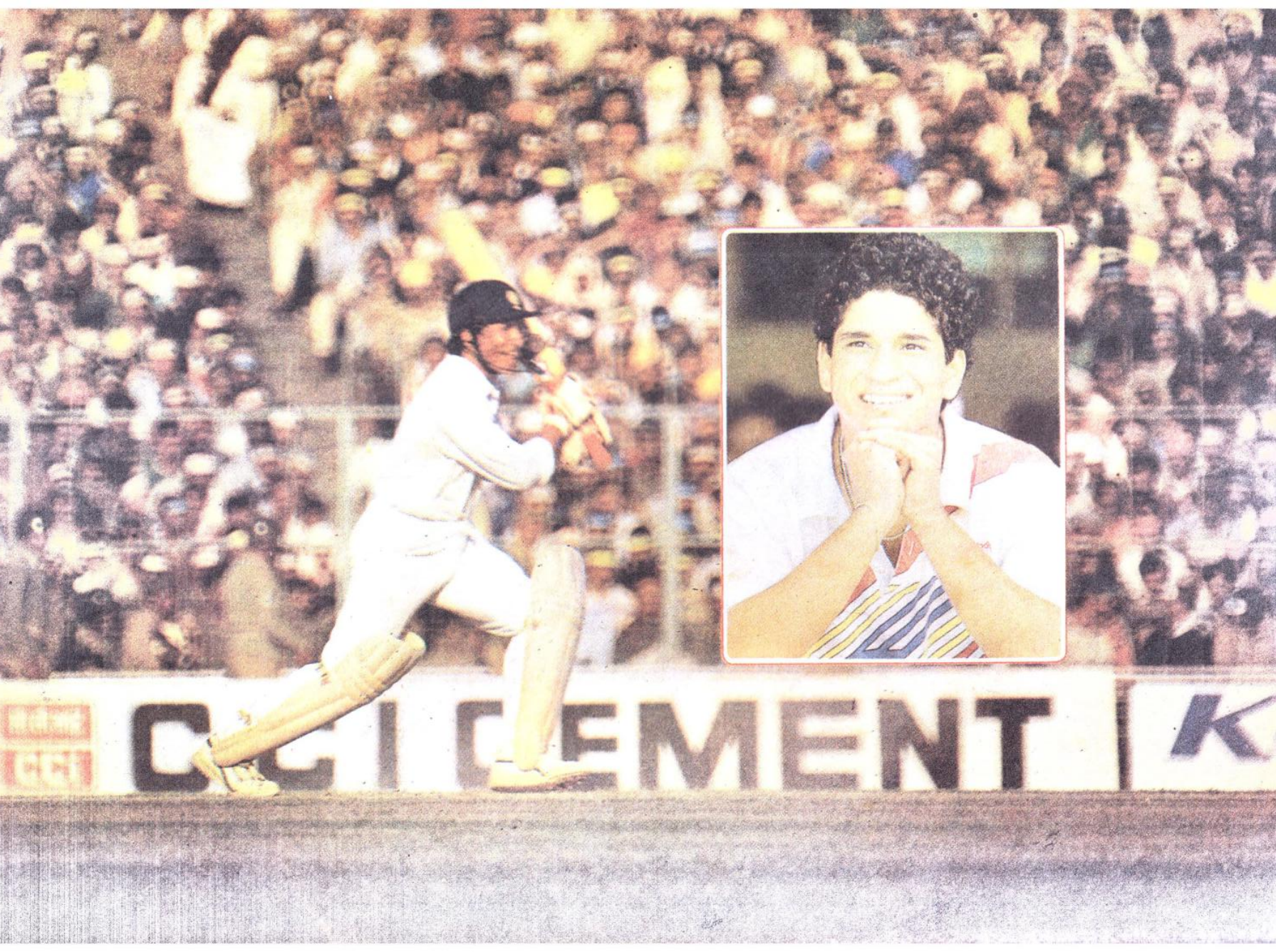
CEMENT

বিশ্বকাপ ক্রিকেটের পরে

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার উত্তেজনা, উন্মাদনা অনেক থিতিয়ে এসেছে। এখন চলছে হিসেব-নিকেশ। দলগত এবং ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের নিরিখে সাফল্য ও ব্যর্থতার খুঁটিনাটি নিয়ে পর্যালোচনা। বিশ্বকাপ ক্রিকেটের হৈচৈ-এর পালা চুকতে না চুকতে বিশ্ব ক্রীড়া ওলিম্পিক নিয়ে মেতে উঠেছেন ক্রীড়া উৎসাহীরা। ওলিম্পিক আসছে, তারই প্রস্তুতি চলছে সারা বিশ্ব জুড়ে। তবে ক্রিকেট, ফুটবলের মতো আর কিছুই অতো জনপ্রিয় নয়।

পঞ্চম বিশ্বকাপের কথা নিয়ে এখনো আলোচনার অন্ত নেই। সেই যে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ভারত এক রানে হেরে গেলো—সেই খেলাটার কথা কেউ কি কোনোদিন ভুলে যেতে পারবেন? অমন উত্তেজনায় টানটান, রোমাঞ্চে ভরপুর খেলা একদিনের ক্রিকেটেই সম্ভব। সেই খেলায় ভারতের ম্যানেজার আব্বাস আলি বেগ, অধিনায়ক মহম্মদ আজহারউদ্দিন যদি আর একটু ট্যাক্টফুল হতেন আর ভারতীয় খেলোয়াড়র সামান্য একটু তৎপরতা দেখাতেন তাহলে ভারতকে ঐ ভাবে এক রানে হারতে হতো না। যেমন হতো না ইংলন্ডের বিরুদ্ধে খেলাটিতেও।

অবশ্য ভাগ্যের ব্যাপারটাও ছিলো। না হলে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে খেলাটি কেন বৃষ্টিতে ভেসে যাবে। আর অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলাটিতে কেন বৃষ্টি এসে ওভার কমিয়ে দেবে। অবশ্য ইংলন্ডকেও কম ভুগতে হয়নি। পাকিস্তানকে মাত্র ৭৪ রানে নামিয়ে দিয়েও বৃষ্টির জন্যে জিততে পারেনি। ফলে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে নিতে হয়েছিলো তাদের। এ সবই খেলার অঙ্গ। ক্রিকেট খেলা হবে অথচ প্রকৃতি বাদ সাধবে না, ঝড়-বৃষ্টি হবে না এমন তো আর হতে পারে না! তাহলে তো ইনডোর ক্রিকেট খেলতে হয়। অস্ট্রেলিয়া ইতিমধ্যেই ইনডোর ক্রিকেট নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করেছে। হয়তো কয়েক বছরের মধ্যেই দেখা যাবে, ইনডোর ক্রিকেট শুরু হয়ে গেছে। তখন ইনডোর ক্রিকেটের বিশবকাপও হবে। যখন হবে, তখন হবে। এখন ওসব নিয়ে মাথা ঘামানোর কি দরকার।

এবারের বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফলাফল এখন রেকর্ডের পাতায় স্থান নিয়েছে। পরবর্তী বিশ্বকাপের আগে

পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী চার বছর এই সব ফলাফল নিয়ে আলোচনা চলবে। একদিনের ক্রিকেট যে পাকাপাকিভাবে ক্রীড়াজগতে স্থান করে নিয়েছে সে বিষয়ে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই।

ভারতের মতো ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটেরও খুবই অগোছালো অবস্থা। সেখানে ক্রিকেট কর্তাদের সঙ্গে সিনিয়ার খেলোয়াড়দের ঠান্ডা লড়াই চলছে অনেক দিন ধরে। সেই জন্যেই ভিভিয়ান রিচার্ডসের মতো খেলোয়াড় খেলতে চেয়েও বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পেলেন না। গর্ডন গ্রিনিজকে ফর্মে থাকা সত্ত্বেও দল থেকে বাদ পড়তে হলো, নিজের সম্মান বজায় রাখতে তাঁকে অবসর নিতে হলো। দুজনে তার আগেই সরে গেছেন। বাকী আছেন শুধু ডেসমন্ড হেইন্স আর ম্যালকম মার্শাল। এঁরা দুজন সরে গেলে দলে তেমন সিনিয়ার বলতে আর কোনো খেলোয়াড় থাকবে না। মার্শাল তো অবসর নেবার কথা বলেই ফেলেছেন। হেইন্সও বোধহয় সেই কথাই ভাবছেন।

গত বছর দল থেকে বাদ পড়ার পর গ্রিনিজ বড় দুঃখে একটা কথা বলেছিলেন। গ্রিনিজ বলেছিলেন, নতুনদের সুযোগ দেওয়া নিশ্চয়ই ভালো। দরকারও। কিন্তু তাই বলে ফর্মে থাকা সত্ত্বেও, সেঞ্চুরি করার পরই আমাদের এইভাবে ছেঁটে ফেলার কোনো যুক্তি নেই। সকলের সঙ্গে আলোচনা করে, আমাদের জানিয়ে যদি নতুনদের চান্স দেবার জন্যে আমাদের বাদ দেওয়া হতো তাহলে কিছু বলার ছিলো না। তা না করে এইভাবে আমাদের ছাঁটাই করে অপমান করার কোনো যুক্তি ছিলো না। সেই জন্যেই নিজের সম্মান রাখতে আমায় অবসর নেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলো।

একই ধরনের কথা একবার সুনীল গাভাসকারও বলেছিলেন। পাকিস্তান থেকে দেশে ফিরেই গাভাসকার যখন শুনলেন তাঁকে দলের নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে তখন মনের দুঃখে তিনি বলেছিলেন, কোটে ধুলো পড়লে লোকে যেমন টোকা দিয়ে তা ফেলে দেয় ভারতীয় দলের অধিনায়কদেরও ঠিক সেই ভাবেই সরিয়ে দেওয়া হয়। তবে জিমি অমরনাথ অর্থাৎ মহিন্দর অমরনাথ সব থেকে বড় সার্টিফিকেট নির্বাচকদের দিয়েছেন। ফর্মের তুঙ্গে থাকা সত্ত্বেও মহিন্দর অমরনাথকে যখন রাজ সিং অ্যান্ড কোং দল থেকে বাদ দিলেন তখন মহিন্দর নির্বাচকদের, 'অ্যা বাঞ্চ অফ জোকার্স' বলে অভিহিত করেছিলেন। তাই নিয়ে কম জল ঘোলা হয়নি। রাজ সিংয়ের সময় ভারতীয় ক্রিকেটে যা হয়েছিলো এবং যার ট্র্যাডিশন এখনো অনেকটাই বজায় রয়েছে, ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটেও গত ক'বছর ধরে তাই চলছে। সেই জন্যেই ভিভিয়ান রিচার্ডস, গর্ডন গ্রিনিজরা এবারের পঞ্চম বিশ্বকাপে খেলতে পারলেন না। যেমন চার বছর আগে রাজ সিংয়ের জন্যে পারেননি মহিন্দর অমরনাথ।

আজহারউদ্দিনের কলমে

প্রত্যেক খেলোয়াড়ের জীবনে এমন এক একটা সময় আসে যখন হাজার চেষ্টা করেও ভালো খেলা যায় না। ডন ব্রাডম্যানের জীবনেও এসেছিল, আমাদের লিটল মাস্টার সুনীল গাভাসকারও বাদ যাননি। সেখানে আমি তো কোন ছার। তবে আমি আত্মবিশ্বাসী। আমি আবার নিজেকে ফিরে পাবো। আর তা খুব শীগগিরই। তোমরা যারা

১৯৮৭ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া দল।

ছোট তারা হয়তো ভাবছো, কেন এমন হয়। এর উত্তর কিন্তু আমার জানা নেই। আসলে ভালোয়-মন্দয় মিশিয়েই তো মানুষের জীবন। খেলোয়াড়দেরও তাই। আজ কেউ ভালো খেললো তো কাল হয়তো পারলোই না। মুশকিলটা তো ঐখানেই। আর কেউ যদি টানা খারাপ খেলে তাহলে আমরা বলি 'ব্যাড প্যাচ', মানে সময়টা খারাপ যাবে। পৃথিবীতে এমন কোনো খেলোয়াড়কে পাবে না যাঁকে এই রকম খারাপ সময়ের ভয়ংকর দিনগুলির মুখে পড়তে হয়নি। অনেকে আবার এই 'ব্যাড প্যাচ' কাটিয়েও উঠতে পারেন না। অথচ একটু সহানুভূতি, আর নির্বাচকদের একটু উদারতা পেলেই হয়তো তাঁরা পারতেন। দুঃখ হয় তাঁদের জন্যে।

সে যাই হোক আমি আজ তোমাদের বলবো আমার দেখা কয়েকজন সেরা খেলোয়াড়ের কথা। গত আট বছর ধরে আমি ভারতীয় দলে খেলছি। সেই সময়ে আমি বিশ্বের অনেক বড় বড় খেলোয়াড়ের সঙ্গে খেলেছি। তাঁদের মধ্যে থেকে কয়েকজনকে আলাদা করে বেছে নেওয়া মুশকিল। তবু শুধু তোমাদের জন্যেই সেই চেষ্টা করছি। সবার আগে বলি আমাদের দেশের খেলোয়াড়দের কথা। প্রথমেই এবং একই সঙ্গে বলতে হবে সুনীল মনোহর গাভাসকার আর কপিলদেব নিখাঞ্জের কথা। সুনীল বিশ্বের সর্বকালের সেরা ব্যাটসম্যানদের একজন। ওঁর দেশপ্রেম, ওঁর আন্তরিকতা, ওঁর অখন্ড মনোযোগ, ওঁর খেলার সাবলীল ভঙ্গি আমায় অনেক শিক্ষা দিয়েছে। ওঁর পাশে কপিলদেব সম্পূর্ণ অন্যরকম। ওঁকে দেখে কে বলবে, উনি বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অলরাউন্ডার। ওঁর মতো পরিশ্রমী, দেশভক্ত এবং বাধা ক্রিকেটার আমাদের দেশে খুবই কম জন্মেছেন। কোনো ব্যাপারেই উনি না বলেন না। যখন যা বলা হয় মুখ বুজে তাই করেন। ওঁর সব থেকে বড় গুণ তরুণ খেলোয়াড়দের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো। সব সময়ই উনি ওদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। ওঁর কথা শুনে চললে যে কোনো খেলোয়াড়ই খুব তাড়াতাড়ি উন্নতি করতে পারবেন। আমার মনে হয় কপিলদেবকে আদর্শ করে আমাদের খেলোয়াড়দের এগিয়ে যাওয়া উচিত। আমি লড়াই করার মানসিকতা গড়ে তুলেছি জিমি অর্থাৎ মহিন্দর অমরনাথকে দেখে। অমন অবহেলিত, অমন অত্যাচারিত অথচ অতো বড় খেলোয়াড় ভারতে খুব কমই জন্মেছেন। অন্যায়ভাবে ওঁকে বারবার দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। দলের বাইরে থেকে যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে তিনি আবার দলে ফিরে এসেছেন। কতোবার যে এমন ঘটনা ঘটেছে। ওঁর মতো লড়াকু মনোভাব ছিলো না বলেই ওঁর দাদা সুরিন্দর অমরনাথ খেলা ছেড়ে দিয়েছিলেন। অথচ সুরিন্দর অমরনাথের মতো দক্ষ ন্যাটা ব্যাটসম্যান ভারতে খুব কমই জন্মেছেন। সুরিন্দর যা পারেননি, মহিন্দর তাই করে দেখিয়েছেন। মহিন্দর আরো কয়েক বছর হয়তো খেলতে পারতেন। কিন্তু তাঁকে খেলতে দেওয়া হলো না। এতে ক্ষতি কিন্তু ভারতেরই হয়েছে, মহিন্দর অমরনাথের কিছু যায়

আমি—
আমার ও আমার একমাত্র সন্তানের
স্বাস্থ্যের ব্যাপারে ভীষণ খুঁতখুঁতে···

আমাদের ডাক্তারবাবুও এ ব্যাপারে
কোন ঝুঁকি পছন্দ করেন না···
তাই আমি ও আমার পরিবারের সবাই ব্যবহার করি

অলিকড

এ্যান্টিসেপ্টিক ম্যাসাজ অয়েল

অলিভ আর কড়লিভার
তেলের নিখুঁত মিশ্রণে তৈরী
সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য
সুবাসিত ম্যাসাজ অয়েল **'অলিকড'**।
শরীরের পুষ্টির জন্য অপরিহার্য্য ফ্যাটি অ্যাসিড এবং
প্রাকৃতিক ভিটামিন এ· ডি এবং ই সুষম মাত্রায়
থাকার ফলে সব ঋতুতেই সবার উপযোগী
একমাত্র ম্যাসাজ অয়েল **'অলিকড'**।
শিশুর জন্ম থেকে শুরু করে
সারা জীবনের সাথী **'অলিকড'**।

প্রস্তুতকারক
গুডম্যান ফার্মাসিউটিক্যাল (ইণ্ডিয়া) প্রাঃ লিঃ
৬৪ বাঙ্গুর এভিনিউ ব্লক–এ, কলিকাতা-৭০০০৫৫
ফোন—৫৯-১১০৭

STANDARD-KORA-GF 1/91/R2

আসেনি।

দেশের গন্ডি ছাড়িয়ে এবার বিদেশের দিকে তাকাই। আমার তালিকায় প্রথমেই আসবেন ভিভিয়ান রিচার্ডস, গর্ডন গ্রিনিজ আর ডেসমন্ড হেইন্সের নাম। ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটারদের যে জাতই আলাদা এঁদের দেখে তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। খেলাটা ওঁদের কাছে খেলাই। ইংলন্ড অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা যেমন খেলাকে জীবন-মরণ সংগ্রাম হিসেবে নেন, ওঁরা তা নেন না। ওঁদের ব্যাটের দাপটের পেছনে আছে অকল্পনীয় মনোযোগ, অধ্যবসায় আর পরিশ্রম। সেই জন্যেই ওঁরা এতো বড়। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক অ্যালান বর্ডার বড় ব্যাটসম্যান কিন্তু দলনেতা হিসেবে ওঁকে যতোটা বড় করে দেখানো হয় আমার মনে হয় উনি ততোটা বড় নন। আমি জানি ওঁর প্রতিটি পদক্ষেপের পেছনে থাকে ববি সিম্পসনের নির্দেশ। সে দিক দিয়ে ইমরান খানের তুলনা নেই। অমন ক্রিকেট বুদ্ধি আর ক্রিকেট জ্ঞান খুব কম খেলোয়াড়ের মধ্যেই দেখেছি। ওঁর খেলার ধার এখন আর আগের মতো নেই। তবু ওঁকে বাদ দিয়ে আজো পাকিস্তান দলের কথা ভাবা যায় না। জাভেদ মিয়াদাদের মতো বড় মাপের ব্যাটসম্যানও বর্তমান বিশ্বে খুব কম আছেন। রিচার্ড হ্যাডলি দুর্দান্ত বোলার। উনি ওভারের ছটি বলেই বৈচিত্র্য আনতে পারেন। তবে হ্যাডলিকে কেন জানি না আমার একটু উদ্ধত, একটু উন্নাসিক বলে মনে হয়েছে। ইংলন্ডের ইয়ান বথামের কথা এতোদিন শুনেছি। ভিডিওতে ওঁর খেলা দেখেছি। উনি ভারতে এসে খেলেও গেছেন কিন্তু এবার ওঁকে কাছ থেকে দেখে বুঝলাম, উনি কেন মহান। এই বয়েস, এতো দিন মাঠের বাইরে ছিলেন তবু আজো তিনি অসাধারণ। ওঁর যে বলে আমি আউট হয়েছিলাম আর শচীন আউট হয়েছিলো সেই বল দুটি যেন স্বপ্নের বল। আমি হলপ করে বলতে পারি ঐ রকম বলে বিশ্বের যে কোনো ব্যাটসম্যানই আউট হয়ে যাবেন।

এবার আসি কয়েকজন বোলারের কথায়। প্রথমেই বলি ম্যাকডরমটের কথা। ওঁকে আমরা যতোটা ভয় পাচ্ছি উনি কিন্তু মোটেই অতোটা ভয় পাবার মতো বোলার নন। অতি সাধারণ মাপের ফাস্ট বোলার। ওঁর চাইতে ইমরান–অবশ্যই তাঁর সময়ে আর এখন ওয়াসিম আক্রম অনেক উঁচু দরের। কপিলের বলের পেস কমে গেছে ঠিকই কিন্তু সুইংয়ের বৈচিত্র্যে তিনি ম্যাকডরমটকে টেক্কা দিতে পারেন। নিজেদের ভুলেই আমরা বারবার ম্যাকডরমটের হাতে জবাই হয়েছি। অথচ ওঁর পাশে ম্যালকম মার্শালকে দেখুন। আগের সেই ধার না থাকলেও মার্শাল আজও বিশ্বের তা-বড় সব বোলারদের টেক্কা দিতে পারেন। আমার তো মনে হয় দক্ষিণ আফ্রিকার ডোনাল্ড ওঁদের কারো চেয়ে কম যান না।

এখন আর কিছু বলবো না। তাড়াতাড়িতে অনেকের নাম বাদ গেলো। পাছে কোনো বিতর্কের সূত্রপাত হয় তাই এই কথাটা বলে রাখলাম।

(সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে)

মহিন্দর অমরনাথ

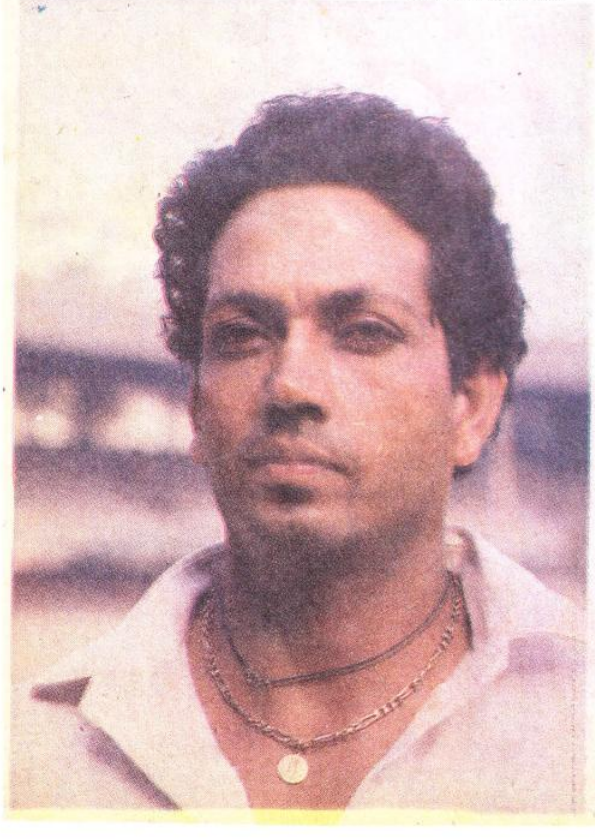

কপিলদেব

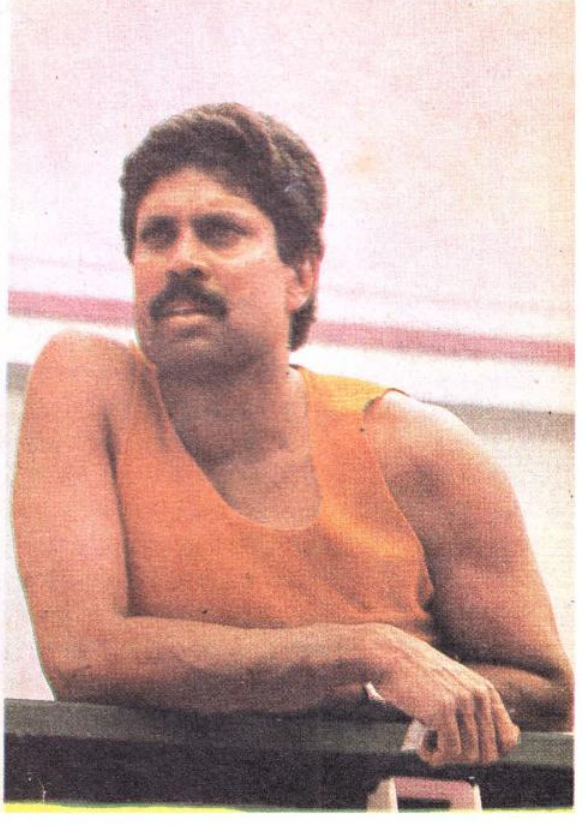

যাঁরা বিশ্বকাপে খেললেন

এবারের বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় যাঁরা খেলেছেন বিশ্বকাপের রেকর্ডের পাতায় তাঁরা স্থান করে নিয়েছেন। এঁদের অনেকেই চার বছর পরে ষষ্ঠ বিশ্বকাপে খেলবেন না। তোমাদের রেকর্ডের পাতাতেও যাতে তাঁরা থাকেন সেইজন্যে এবারের বিশ্বকাপে যে নটি দেশ খেলেছে তাদের সম্পূর্ণ খেলোয়াড় তালিকা দেওয়া হলো।

অস্ট্রেলিয়া ঃ অ্যালান বর্ডার (অধিনায়ক), মার্শ, বুন, জোন্স, মার্ক টেলর, স্টিভ ওয়র, মার্ক ওয়র, ব্রুস রিড, হিলি, মার্ভ হিউজ, ম্যাকডরমট, পিটার টেলর, মাইক হুইটনি ও টম মুডি।

ইংলন্ড ঃ গ্রাহাম গুচ (অধিনায়ক), বথাম, স্টুয়ার্ট, ল্যাম্ব, ফেয়ারব্রাদার, হিক, রবিন স্মিথ, লিউইস, রিভি, ডেফরিটাস, স্মল, প্রিংগল, টাফনেল ও রিচার্ড ইলিংওয়র্থ।

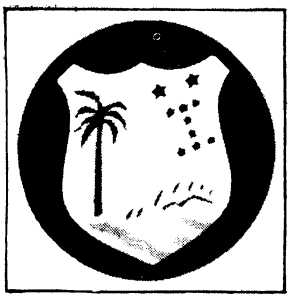

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ঃ রিচার্ডসন (অধিনায়ক), হেইন্স, সিমনস, আর্থারটন, লারা, লোগি, হুপার, মার্শাল, অ্যামব্রোস, কুমিনস, বেঞ্জামিন, প্যাটারসন, হারপার ও উইলিয়ামস।

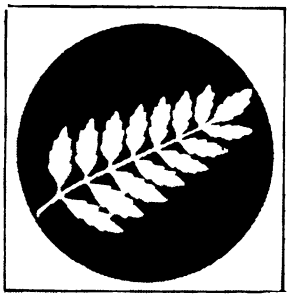

নিউজিল্যান্ড ঃ মার্টিন ক্রো (অধিনায়ক), কেয়ার্নস, গ্রেটব্যাচ, হ্যারিস, জোন্স, লারসেন, লেথাম, মরিসন, দীপক প্যাটেল, কেন রাদারফোর্ড, ইয়ান স্মিথ, ওয়াটসন, জন রাইট ও মারফি।

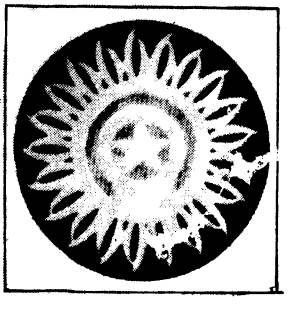

ভারত ঃ মহম্মদ আজহারউদ্দিন (অধিনায়ক), রবি শাস্ত্রী, কপিলদেব, শ্রীকান্ত, শচীন তেন্ডুলকার, সঞ্জয় মঞ্জরেকার, মনোজ প্রভাকর, কিরণ মোরে, শ্রীনাথ, সুব্রত

ব্যানার্জী, বেঙ্কটপতি রাজু, প্রবীণ আমরে, বিনোদ কাম্বলি ও অজয় জাদেজা।

পাকিস্তানঃ ইমরান খান (অধিনায়ক), জাভেদ মিয়াদাদ, রামিজ রাজা, আমীর সোহেল, ইনজামুল হক, জাহিদ ফজল, সেলিম মালিক, ইজাজ আমেদ, মঈন খান, ওয়াসিম আক্রাম, আকিব জাভেদ, মুস্তাক আমেদ, ইকবাল সিকান্দার ও ওয়াসিম হায়দার।

শ্রীলঙ্কাঃ অরবিন্দ ডিসিলভা (অধিনায়ক), অশাংক গুরুসিংঘে, মহানামা, সমরশেখর, হাথারুসিংঘে, অর্জুন রণতুঙ্গ, জয়সূর্য, তিলিকরত্ন, রুমেশ রত্নায়েক, (গ্রেম লেব্রয়), রামানায়ক, কপিলা, ডন অরুনশ্রী, কালপাগে ও প্রমোদ উইকারমা সিংঘে।

জিম্বাবুয়েঃ ডেভিড হাউটন (অধিনায়ক), এডো ব্রানডেস, ক্যাম্পবেল, কেভিন আরনট, বুচার্ট, অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার, গ্র্যান্ড ফ্লাওয়ার, ম্যালকম জার্ভিস, পাইক্রফট, জন ট্রাইকোস, ওয়ানে জেমস, মার্ক রুমস্টার, আলি শা ও অ্যান্ডি ওয়ালার।

দক্ষিণ আফ্রিকাঃ কেপলার ওয়েসেলস (অধিনায়ক), কুইপার, হাডসন, ক্রনজে, মার্ক রাসমেরে, ক্রিস্টেন, রোডস, রিচার্ডসন, প্রিংগল, ওমর হেনরি, অ্যালান ডোনাল্ড, রিচার্ড স্মেল, ম্যাকমিলান ও টারট্যিয়াস।

দক্ষিণ আফ্রিকার খেলোয়াড়রা

উক্তি

কপিল যতোদিন খেলবে ততোদিন পর্যন্ত শচীন কিছুতেই ভারতীয় দলের সুপারস্টার হতে পারবে না। কপিলের বয়েস এখন মাত্র ৩৩ ওর আরো কিছুদিন অন্তত খেলার কথা। খেলবেই। শচীনকে ততোদিন অপেক্ষা করতেই হবে। মনে হচ্ছে, এই শচীনই একদিন আমার সব রেকর্ড ভেঙে দেবে।

–সুনীল গাভাসকার

(সম্প্রতি একটি লেখায় এই মন্তব্য করেছেন)

বিশ্বকাপের একী জঘন্য নিয়ম। পরে যে দল ব্যাট করবে বৃষ্টির জন্যে যদি সেই দলের ওভার কমিয়ে আনতে হয় তাহ'লে আগে যারা ব্যাট করছে তাদের যে ওভারগুলিতে সব থেকে কম রান উঠেছে সেই ওভারগুলো বাদ দিয়ে হিসেব করা হবে। যেমন ভারত অস্ট্রেলিয়ার খেলায় বৃষ্টির জন্যে আম্পায়াররা তিন ওভার কমিয়ে এনেছিলেন ভারতের ইনিংসের অস্ট্রেলিয়ার ব্যাট করা পঞ্চাশ ওভার থেকেও তিন ওভার বাদ গেলো। কোন তিন ওভার বাদ গেলো? যে তিন ওভারে ওরা সব চেয়ে কম রান করেছে। বাদ গেলো ভারত যে ওভারটি মেডেন পেয়েছিলো সেটি, আর একটি ওভারে শুধু একটি লেগ বাই হয়েছিলো সেটি আর একটি ওভারে ওরা তুলেছিলো মাত্র একটি রান। অর্থাৎ সব মিলিয়ে তিন ওভারে দু রান এর কোনো মানে হয়?

–মহম্মদ আজহারউদ্দিন

(অস্ট্রেলিয়ার কাছে এক রানে হেরে যাবার পর মনের দুঃখে)

একদিনের ক্রিকেটে হারজিৎ আছেই। কিন্তু যে নিয়মে আমরা জিতলাম তাকে সাপোর্ট করা যায় না। তবে এ রকম যে হতে পারে আমি আগে বুঝতে পেরেছিলাম আকাশে মেঘ দেখে, তাই তো আগে ব্যাট করেছিলাম।

–অ্যালান বর্ডার

(খেলার শেষে ভারতের পরাজয় সম্বন্ধে বলতে গিয়ে)

ভারতীয় দলে একজনই ভিলেন তাঁর নাম রবি শাস্ত্রী। রবিকে বাদ দিয়ে ভারত যদি গাব্বায় অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলতে নামতো তাহলে বোধহয় এভাবে ভারতকে এক রানে হারতে হতো না। রবিকে দল থেকে বাদ দেবার কথা আমি অনেক দিন থেকেই বলে আসছি। কেউ আমার কথা কানেই তুললো না।

–বিষেণ সিং বেদী

(অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপে ভারত এক রানে হেরে যাবার পর)

মনসুর আহম্মদ (পলাশী, বীরভূম)

উত্তরঃ তুমি ঠিকই লিখেছো। পাকিস্তান নয় গত অক্টোবর মাসে ভারতে খেলে গেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। পাকিস্তান তাদের ভারত সফর একেবারে শেষ মুহূর্তে বাতিল করে দিয়েছিলো।

সুমন্ত রায় (কল্যাণনগর, রহড়া)

উত্তরঃ তোমার গড়া বিশ্ব একাদশ দলটি ছেপে দেওয়া হলোঃ অ্যালান বর্ডার (অধিনায়ক), গ্রাহাম গুচ (সহঃ অধিনায়ক), ডেসমন্ড হেইন্স, জাভেদ মিয়াদাদ, অরবিন্দ ডিসিলভা, কপিলদেব, ফিল ডেফরিটাস, মঈন খান (উইকেটরক্ষক), টাফনেল, ম্যাকডরমট ও ডোনাল্ড।

রথীন্দ্রনাথ দে (শান্তিধাম, জি টি রোড, কোন্নগর, হুগলি)

প্রশ্নঃ টেস্ট ও একদিনের ক্রিকেটে কপিলের বোলিংয়ের হিসেব জানতে চাই

উত্তরঃ ছাপা হয়েছে সম্প্রতি। দেখেছো নিশ্চয়ই।

শ্রীপর্ণা ঘোষ (অমিতা ঘোষ রোড, কলকাতা–২৯)

তোমাদের জিজ্ঞাসা

প্রশ্নঃ সঞ্জয় মঞ্জরেকারের জন্মদিন ও বাড়ির ঠিকানা জানতে চাই।

উত্তরঃ সঞ্জয়ের জন্ম ১২ জুলাই ১৯৬৫ সালে। ওঁকে C/o বোম্বাই ক্রিকেট সংস্থার ঠিকানায় চিঠি লিখলেই উনি পেয়ে যাবেন।

পূর্বা পাত্র (নিউ পঞ্চাননতলা রোড, বেলঘরিয়া, কলকাতা–৫৬)

প্রশ্নঃ রবি শাস্ত্রীর বাড়ির ঠিকানা জানতে চাই।

উত্তরঃ রবি শাস্ত্রীকে বোম্বাই ক্রিকেট সংস্থা C/o ওয়াংখাড়ে স্টেডিয়াম, বোম্বাই, এই ঠিকানায় চিঠি দিলেই উনি পেয়ে যাবেন। তুমিও নববর্ষে আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করো।

প্রিন্স দত্ত (হাটগোবিন্দপুর, বর্ধমান)

প্রশ্নঃ ভারত কোন দেশের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলে? কোন সালে? সেবার ভারতের অধিনায়ক কে ছিলেন?

উত্তরঃ ইংলন্ডের বিরুদ্ধে–১৯৩২ সালে। ভারতের অধিনায়ক ছিলেন সি. কে. নাইডু।

রাজু সাধুখাঁ (হীরাপুর, হাওড়া)

প্রশ্নঃ ধরুন একজন ব্যাটসম্যান 'রানার' নিয়ে খেলছেন। বোলারের বলটি ব্যাটসম্যান খেলতে পারলেন না। তিনি নিজে তখন ক্রিজের মধ্যেই আছেন, কিন্তু 'রানার' ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে গেছেন। এই অবস্থায় ব্যাটসম্যানকে কি স্টাম্প আউট বা রান আউট করা যাবে?

উত্তরঃ নিশ্চয়ই যাবে। 'রানারের' দোষে ব্যাটসম্যান আউট হয়ে যাবেন।

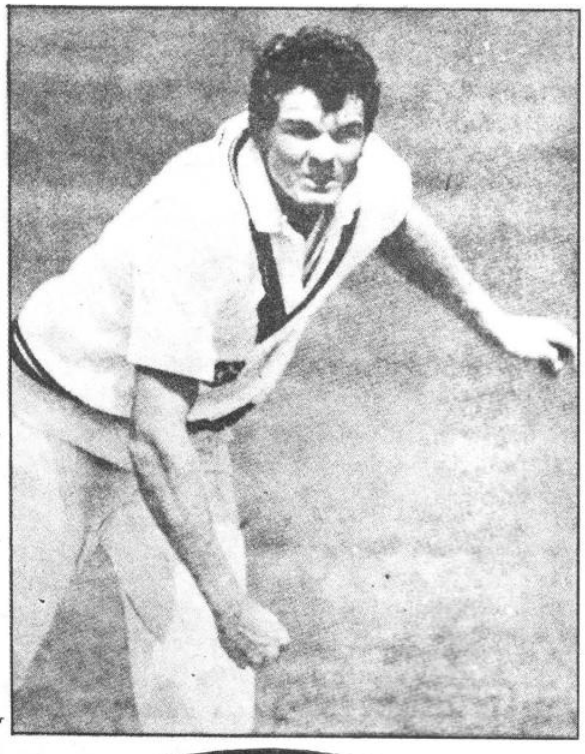

অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট বোলার ম্যাকডরমট

ছদ্মবেশে

পল ব্রাইটনারের নাম নিশ্চয়ই মনে আছে। জার্মান দলের ডাকসাইটে খেলোয়াড়। গত বিশ্বকাপের ফাইনালে পশ্চিম জার্মানির দুটি গোলের একটি করেছিলেন ব্রাইটনার। অন্যটি গার্ড মুলার। বিশ্বকাপের পর এই দুই খেলোয়াড়ের দাম হু-হু করে বেড়ে গেলো। বিশ্বের ধনী ক্লাবগুলো হাত বাড়ালো এঁদের দলে পেতে। অন্যরা যখন মোটা টাকা আর আনুষঙ্গিক সুবিধে-টুবিধের অফার দিচ্ছে তখন এঁদের দু'জনকে দলে পেতে একরকম ঝাঁপিয়ে পড়লো স্পেনের রিয়েল মাদ্রিদ। স্পেনে এসে খেলার জন্যে রিয়েল মাদ্রিদের কর্তারা ব্রাইটনার আর মুলারের বাড়ি গিয়ে ধর্না দিতে শুরু করলেন। মুলারকে তাঁরা বলেন, তোমায় আমরা ব্লাংক চেক দিচ্ছি। যতো খুশি টাকা নিতে পারো তুমি। আর ব্রাইটনারকে বললো, ব্রায়ান মিউনিখ তোমায় যে টাকা দিচ্ছে আমরা তোমায় তার চারগুণ দেবো। চলো আমাদের ক্লাবে খেলবে।

এ খবর চাপা থাকতে পারে না। থাকলোও না। হৈচৈ শুরু হয়ে গেলো। দেশের মানুষ চান না ব্রাইটনার আর মুলার স্পেনে খেলতে যান। ব্রায়ান মিউনিখ তো চায়ই না। ব্রায়ান মিউনিখের কর্তারা ফ্রাঞ্জ বেকেনবাউয়ারকে গিয়ে ধরলেন। বেকেনবাউয়ার মুলারকে অনুরোধ করলেন দেশ ছেড়ে না যেতে। জার্মানিতে বেকেনবাউয়ারের আলাদা সম্মান। তার ওপর তাঁর জন্যেই দু-দুবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পশ্চিম জার্মানি। অনেক খেলোয়াড়ের কাছে বেকেনবাউয়ারের স্থান অনেকটা ভগবানের মতো। সেই বেকেনবাউয়ারের অনুরোধ ঠেলতে পারলেন না মুলার। তিনি সাফ জানিয়ে দিলেন, ব্রায়ান মিউনিখ ছেড়ে তিনি স্পেনে খেলতে যাবেন না। ব্লাংক চেকের দরকার তাঁর নেই।

ওদিকে ব্রাইটনারের সঙ্গে বেকেনবাউয়ারের সম্পর্কটা ঠিক ততোটা ভালো নয়। তাই বেকেনবাউয়ারকে না জানিয়ে ব্রায়ান মিউনিখের কর্তারা ব্রাইটনারকে অনুরোধ করলেন, দেশ না ছাড়তে। মুলারকে স্বয়ং বেকেনবাউয়ার অনুরোধ করেছেন। ব্রাইটনার ভেবেছিলেন, ফুটবলের কাইজার নিশ্চয়ই তাঁকেও অনুরোধ করবেন। বেশ হবে তাহলে। মন চাইলে দু চারটে কথাও শুনিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু ক্লাবের কর্তারা বেকেনবাউয়ারকে কিছু না বলে নিজেরাই ব্রাইটনারকে অনুরোধ করলেন। ফলে ব্রাইটনার ব্যাপারটা ভালো চোখে দেখলেন না। তাঁর অভিমান হলো। শুধু তাই নয় ব্রুনথল গ্রামে ব্রাইটনারের বাড়িতে পাহারাদার বসালেন ক্লাবের কর্তারা। আরো ক্ষেপে গেলেন ব্রাইটনার। অপমানিতবোধ করলেন।

ব্রাইটনার তখন তাঁর স্ত্রী হিলডার সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলেন যে তিনি এই অপমানের বদলা নেবার জন্যে স্পেনেই চলে যাবেন। কিন্তু যাবেন কি করে? বাড়ির চারদিকে যে পাহারাদার! সুতরাং ছদ্মবেশ ধরতে হলো ব্রাইটনারকে। হিলডার সাহায্যে ছদ্মবেশে ব্রাইটনার গ্রাম ছাড়লেন। তারপর মিউনিখ থেকে প্লেন ধরে সোজা স্পেনে। সই করলেন রিয়েল মাদ্রিদে। ব্রাইটনার পালিয়ে গেছেন শুনে রাগে ফেটে পড়লো গ্রামের লোক। তারা আক্রমণ করলো ব্রাইটনারের বাড়ি। একা হিলডা সামলালেন সব কিছু। খবর দিলেন পুলিশে, অল্পস্বল্প ভাঙচুর হলেও পুলিশ এসে সামাল দিলো। পুলিশই পাহারা দিতে লাগলো ব্রাইটনারের বাড়ি। আর ব্রাইটনার খেলতে লাগলেন স্পেনের রিয়েল মাদ্রিদ ক্লাবে!

ইমরান ও আজহারউদ্দিন

পড়ার সঙ্গে খেলা

চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া হাই স্কুল (বয়েজ)

বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়

এমন একটা স্কুলের কথা যদি কল্পনা করা যায়, যার সামনে থাকবে বিশাল সবুজ খেলার মাঠ, আর চারপাশ ঘিরে কোনো পাঁচিল নয়, শুধু বড় বড় গাছের সারি; আর মাঠের শেষপ্রান্ত ছুঁয়ে চলে যাবে উধাও রেল লাইন। ক্লাসে বসে জানলার বাইরে তাকালেই চোখে পড়বে ধানক্ষেত। মাঝেমাঝে ধানক্ষেতে বয়ে যাওয়া বাতাস স্নেহের স্পর্শ দিয়ে যাবে পড়ুয়াদের চোখে মুখে। কল্পনায় আঁকা এই বিদ্যালয়ের ছবি খুঁজে পাওয়া গেছে বাস্তবে, যার ঠিকানা উত্তর ২৪ পরগনার চাঁদপাড়া স্টেশনে। বিদ্যালয়ের নাম ঢাকুরিয়া হাই স্কুল (বয়েজ)।

গ্রামের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বলে কখনোই ছোট ভাবা যাবে না এই স্কুলকে। কারণ ১৯৬৫ সাল থেকে ৮৯ সাল পর্যন্ত মাধ্যমিকের ছাত্ররা জাতীয় বৃত্তি পেয়ে আসছে। ৯০ সালে অবশ্য মাধ্যমিকের ফল তেমন আশানুরূপ হয়নি। প্রধান শিক্ষক কমলেন্দু দাস বললেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সিলেবাস শেষ করা, বাড়িতে কাজ দেওয়া এবং প্রতিদিন স্কুলে পড়া নেওয়া ছাড়া অতিরিক্ত চাপ ছাত্রদের উপর দিতে পারছি না, কেননা বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রই হলো গরীব চাষী পরিবারের। তাই পড়াশোনায় তারা অতিরিক্ত সময় দিতে পারে না। তবে হ্যাঁ, এরই মধ্যে থেকে যতটুকু ভালো ফলাফল ছাত্রেরা করতে পারে, সে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি সাধ্যমতো।

শুধু পড়াশোনা নয়, খেলাধূলাতে স্কুল যাতে এগিয়ে যেতে পারে, সে ব্যাপারে সাধ্যমতো চেষ্টা করে চলেছে শিক্ষক ও ছাত্রেরা। ভলিবল ও খো-খো খেলার ব্যবস্থা থাকলেও ফুটবল ও অ্যাথলেটিক্সেই ছাত্ররা বেশি উৎসাহী। জানালেন প্রধান শিক্ষক মহাশয়।

ফুটবলে গোষ্ঠ পাল, ইন্টার স্কুল ফুটবল আর ইনসেনটিভ গেম-এ স্কুল যোগদান করে আসছে। ৮৯ সালে গোষ্ঠ পাল ট্রফিতে সাব-ডিভিশন রানার্স হয়েছিলো স্কুল। ফুটবল দলের নিয়মিত খেলোয়াড়রা হলো–অনুপ মল্লিক, দিলীপ সরকার, অমরেশ চক্রবর্তী, প্রবীর চক্রবর্তী, অমিত মজুমদার, পিনাকী দাস, কার্ত্তিক চক্রবর্তী, সমীর দাস ও সৌমেন চ্যাটার্জী।

অ্যাথলেটিক্সে স্কুল ১০০, ২০০, ৪০০, ৮০০ ও ১৫০০ মিঃ রান, ডিসকাস, শট্‌পাট্‌ আর জ্যাভেলিনে অংশগ্রহণ করে। স্কুলের পারফরমেন্সও খুব ভালো। নিয়মিত অ্যাথলিটরা হলো সন্তোষ বিশ্বাস, পতিতপাবন সরকার, গোপাল সরকার, উত্তম সাহা, সঞ্জীব দাস ও ভীষ্মদেব বিশ্বাস। শুনলে অবাক লাগে যে, এদের অধিকাংশই প্রচন্ড দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে চলেছে। যেমন সন্তোষ বিশ্বাস। ক্লাস এইট-এর ছাত্র। ট্রেনে লজেন্স বিক্রি করে সংসারের জন্য প্রতিদিন দশ টাকা যোগাড় করতে হয়। এরই ফাঁকে পড়াশোনা ও নিয়মিত অনুশীলন চালাতে হয়। তা সত্ত্বেও ৮৯-এ ওপেন বেঙ্গলে ৪০০ মিঃ রানে প্রথম ও রিলে রেসে দ্বিতীয় হয়েছে। এ ছাড়া ৯০ সালে উত্তর ২৪ পরগনার ২০০ ও ৪০০ মিঃ রানে জেলায় প্রথম স্থানটি পায়।

আরও একজন এইট-এর ছাত্র সম্ভাবনাময় অ্যাথলিট, নাম গোপাল সরকার। তাঁত চালিয়ে তার সংসার চলে। ৯০-এ জেলা স্তরে শট্‌পাট্‌ ও ডিসকাসে প্রথম হয়। ৮৯-এ বেঙ্গলে শট্‌পাটে প্রথম হয়েছিলো। এ ছাড়া সম্প্রতি মোহনবাগান অ্যাথলিট মিটের শট্‌পাট্‌-এ (বয়েজ বিভাগে) চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

স্কুলের অ্যাথলিট (বাঁদিক থেকে) সন্তোষ বিশ্বাস, গোপাল সরকার, পতিতপাবন সরকার ও উত্তম সাহা।

এত পরিশ্রম করেও ভালোমতো পুষ্টি এদের কারোর জোটে না। অবশ্য প্রধান শিক্ষক মহাশয় ও অন্যান্য শিক্ষকেরা কিছুটা সাহায্য করে যাচ্ছেন। কিন্তু তা খুব সামান্য।

বিদ্যালয়ের গেমস টীচার বাসুদেব সিন্‌হা জানালেন, ৯০ সালে বিচারকদের ভুল সিদ্ধান্তের জন্য তাঁদের স্কুল ইনসেনটিভ গেম-এ অ্যাথলেটিক্স বিভাগে মাত্র ১ পয়েন্টের জন্য প্রথম হতে পারেনি। তাঁর সঙ্গে সায় দিলেন সাহায্যকারী শিক্ষক অজিত মন্ডল ও দিলীপ সরকার। আরও বাইরের প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার ইচ্ছা থাকলেও তাঁদের সামর্থ্য নেই। কারণ অর্থনৈতিক। এ কথাও জানালেন গেমস টীচার। শুনে ভালো লাগলো যে, এইসব সমস্যা থাকা সত্ত্বেও বাইরের যে সমস্ত অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় স্কুল অংশগ্রহণ করে থাকে তার পুরো ব্যয়ভার বহন করেন সমস্ত শিক্ষকরা।

শরীর গড়তে যোগ ও ব্যায়াম

তুষার শীল

কারলিং

দেখতে দেখতে আবার একটা নতুন বছর এসে গেল। বছরের প্রথমেই আমাদের অঙ্গীকার করতে হবে যেন লেখাপড়া, খেলাধূলায় অনেক উন্নতি করতে পারি। আর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি আমাদের দেশটিকে। তবে সবার আগে চাই স্বাস্থ্যটিকে মজবুত করা। দুর্বল শরীর নিয়ে আমরা কোনো স্বপ্নকেই সার্থক করতে পারব না। একজন খেলোয়াড় শুধু মাঠেই তৈরি হয় না। পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য তার চাই বিজ্ঞানভিত্তিক শরীরচর্চা যেটা ব্যতিরেকে কেউই আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌছাতে পারবে না। আজ ভারতের খেলাধূলায় পিছিয়ে আসার মূল কারণই হচ্ছে এই সত্যটাকে অবহেলা করার ফল। তোমাদের ইচ্ছাশক্তি আর চেষ্টাই পারে সত্যিকারের ভাল কিছু করতে।

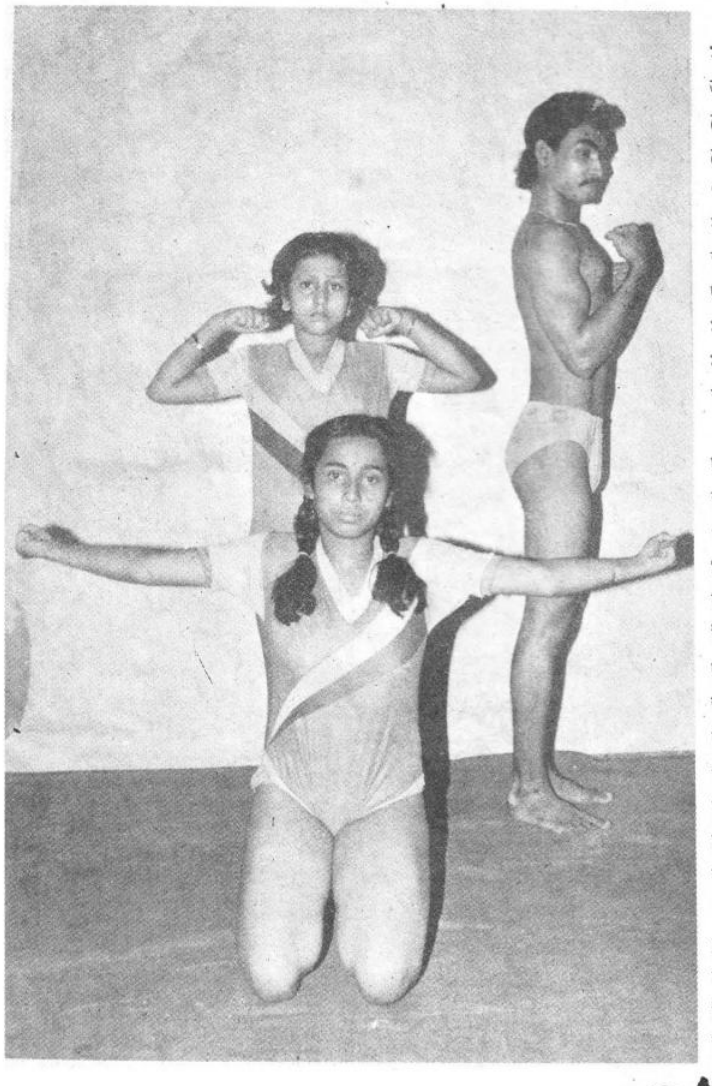

আজকে যে ব্যায়াম দুটি শেখাবো সেগুলো উপর হাতের সামনের পেশী অর্থাৎ বাইসেপসের ব্যায়াম। রোগা হাতের জন্য যারা লজ্জা পাও তারা অবশ্যই এই ব্যায়াম দুটি বা যে কোনো একটি করবে। প্রথমে ছেলেটি যেভাবে করছে, সেটি শেখাই। দু'হাত মুঠি করে দু'পাশে ঝুলিয়ে অর্থাৎ হাত দুটি গায়ের সঙ্গে লাগিয়ে রেখে দাঁড়াও। এখন শ্বাস নিতে নিতে কনুই থেকে হাতের নিচের অংশ ভাঁজ করে উপরের দিকে তুলে আনো ছেলেটির মতো। পরমুহূর্তেই শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে হাত সোজা করে দিয়ে আগের অবস্থায় চলে যাও, যাকে বলে ঝুলিয়ে দাও। পর পর ৮/১০ বা তোমার সাধ্যমত যতবার পার কর প্রতি মাত্রায়। ২/৩ বা ততোধিক মাত্রায় অভ্যাস কর। এটি হলো এক রকম।

এবার মেয়ে দুটি যেভাবে করছে সেই ভাবেও শিখে নাও। ছবির সামনের মেয়েটির মতো নীল ডাউন বা বজ্রাসনে বস অথবা পিছনের মেয়েটির মতো দাঁড়িয়েও করা যায়। বসে থাকা মেয়েটির মতো হাত দুটি মাটির সঙ্গে সমান্তরালভাবে মুঠি করে তুলে রাখ। এটি প্রথম অবস্থান। এখন এস দ্বিতীয় অবস্থানে। শ্বাস নিতে নিতে দু'হাতে ভাঁজ করে দাও ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটির মতো, পরমুহূর্তেই হাত দুটি ছড়িয়ে দাও প্রথম অবস্থানের মতো। অর্থাৎ শ্বাস নিয়ে হাত ভাঁজ, শ্বাস ছেড়ে হাত সোজা। সব সময় খেয়াল রাখবে হাত দু'টি যেন মাটির সমান্তরাল থাকে। কিছুদিন এই ব্যায়াম করার পর, হাত ভাঁজ করা অবস্থান থেকে সোজা করার সময় দু'হাতের কব্জি ঘুরিয়ে মাটির দিকে করে দেবে। আবার তোলার সময় মুঠি উপরের দিকে করে দিতে ভুলবে না। মাত্রা বা বার আগেরই মতো।

মেয়েরাও এই ব্যায়ামটি করবে। কারণ যাদের হাত চর্বিজনিত মোটা তারা এতে উপকার পাবে। হাতের জোর বাড়বে। হাতের বাতজনিত বিভিন্ন ব্যথা দূর হবে। নিয়মিত কিছুদিন অভ্যাসের পর তোমার সাধ্যমত দু'হাতে দুটি ওজন নিয়ে নিও।

সব্যসাচী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ঘণ্টা দুই এইভাবে চলার পর অপ্রত্যাশিত সুযোগ হয়ে গেল তাঁদের। হঠাৎই সম্মুখে দেখতে পেলেন প্রশস্ত রাস্তা একটা। বড় বা ছোট গাছ, ঝোপঝাপ বা কাঁটালতা, কোনো কিছুর বালাই তার কোথাও নেই। হাতীর রাস্তা, এইরকম একটা নাম শোনা ছিল কয়েকজন পুরোনো নাবিকের। তারাই বলল–এটাই সম্ভবতঃ হাতীর রাস্তা একটা। বুনো হাতীরা শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে ভেঙে ফেলে মাথার উপরকার ঝুলন্ত ডাল বা উপড়ে ফেলে দেয় সম্মুখবর্তী ছোট গাছ। আর ঝোপঝাড় কাঁটা বন? সে সব তো তাদের পায়ের তলায় মাটিতে মিশে যায়। গভীর অরণ্যের বুকে এই জাতীয় চওড়া রাস্তা নাকি কোথাও কোথাও আছে আফ্রিকায়।

সাধারণত এসব রাস্তার শেষ প্রান্তে থাকে কোনো বৃহৎ জলাশয়। জল বুনো হাতীর সর্বদা প্রয়োজন, প্রচুর পরিমাণেই প্রয়োজন। যেখানে বারো মাস জলের অফুরন্ত যোগান আছে, সেইরকম জায়গাতেই এমনি রাস্তা বানিয়ে নেয় বুনো হাতীরা। তা হলে? এটা ধরে নেওয়া চলে যে অদূরেই কোনো লোকবসতিও আছে এই বনে। নিশ্চয়ই কোনো কৃষ্ণাঙ্গ বনবাসী উপজাতি।

তা যদি হয়, তাহলে এটাও অনুমান করা যেতে পারে সেই কৃষ্ণাঙ্গরাই দায়ী মিস পোর্টারের অন্তর্ধানের জন্য!

ঐ কৃষ্ণাঙ্গ জাতি?

চল তাহলে, আক্রমণ করা যাক সেই পাপিষ্ঠদের। শ্বেতাঙ্গিনী জেনকে তাদের কবল থেকে উদ্ধার করা যাক, তাদের গ্রামগঞ্জ ঘর-বাড়ি ক্ষেত-খামার সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে পায়ের তলায় মাড়িয়ে সমভূমি করে দেওয়া হোক। শ্বেতাঙ্গিনীর অমর্যাদা? সুসভ্য ইংরেজ ফরাসীরা তা কখনও বরদাস্ত করবে না।

ইউরোপীয় কণ্ঠের রণহুঙ্কারে সেদিন ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হলো আফ্রিকার আরণ্য উপকূল। সিংহের মাটি-কাঁপানো আকাশ-ফাটানো গর্জনকে সেদিন দমিয়ে দিল ফরাসী বাহিনীর জয়ধ্বনি। হাতীর পথের প্রান্তে যখন এসে পড়েছে দলটা, বনভূমি আঁধার করে সন্ধ্যা তখন এসেছে নেমে।

একটা জলাশয়ই বটে। আয়তনে বৃহৎ নয়, তবে গভীরতায় বেশ। আর শত অযত্ন সত্ত্বেও জলও তার নির্মল। বিভিন্ন জায়গায় ঘাট বানিয়ে বিভিন্ন পশু পালে পালে জল খাচ্ছে। এই এখানে এক পাল হরিণ নামছে জলে, ঐ ওখানে জল-খাওয়া সমাধা করে অঙ্গ দুলিয়ে কূলে উঠে যাচ্ছে এক পাল নাদুসনুদুস শ্বেত বরাহ। ভুলক্রমেও কোনো জাতের কোনো

প্রাণী প্রয়োজনের অতিরিক্ত দেরি করছে না এক মুহূর্তও। এটা একটা বন্য শিষ্টাচার। সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে আসার আগেই জল-পান শেষ করে সব তৃষিত প্রাণীই নিজের নিজের বিবরে ফিরতে চায়। পালা অনুযায়ী জল প্রত্যেকেই পেতে চায় তো।

দেয়ার্নো আর কার্পেন্টিয়ারের কড়া শাসন, এ-সময়ে কোনো পশুকে যেন কেউ গুলি না করে। প্রথমত এটা শিকারের অভিযান নয়, দ্বিতীয়ত কৃষ্ণাংগরা যদি এখনও সাদা মানুষদের উপস্থিতি টের না পেয়ে থাকে, লক্ষ্যহীন বন্দুকবাজি করে কেন তাদের তা জানিয়ে দেওয়া? অতর্কিতে আক্রমণ করতে পারলেই তো আক্রমণকারীর পক্ষের অশেষ সুবিধা!

কৃষ্ণাংগরা সত্যই টের পায়নি। সৈনিকেরা যখন দীঘির পশ্চিম পাড়ে, ওরা তখন জটলা করছে পুবে। ওরা এখানে মৃগয়ার জন্যও আসেনি আজ, আসেনি কোনো শত্রুসেনার বিরুদ্ধে ঘাঁটির পত্তন করবার জন্যও। অত্যন্ত নির্দোষ একটা উদ্দেশ্য নিয়ে ওরা আজ জমায়েত হয়েছিল এখানে। এ-জলাশয়ের পশ্চিম কূলটা যেমন পরিচ্ছন্ন, প্রধানত হাতীর পথের অস্তিত্বের দরুনই, পুব কূলটা আবার তেমনি নিবিড় বনানীতে আচ্ছন্ন। সনাতন শুঁড়িপথ ছাড়া এমন অন্য কোনো পথ নেই, যা দিয়ে বন্য জন্তু বা বন্য উপজাতিরা যাতায়াত করতে পারে।

কৃষ্ণাংগরা অবশ্য এসে থাকে। না-এসে পারে না তারা। তারা পানীয় জল সংগ্রহ করে এই জলাশয় থেকেই। সাধারণ ব্যবহারের জল তারা অবশ্য কূপ থেকে পায়। কিন্তু সেসব কূপ গভীর নয়। তার জলও নয় পানযোগ্য। তাছাড়া, অন্য প্রয়োজনও থাকে তাদের এখানে। এই বনেই তাদের দেবস্থান। তাদের দেবাদিদেব যে বোংগা, সর্বশক্তিময়, সর্বনিয়ন্তা সর্বেশ্বর, তাঁর অধিষ্ঠানও যে এই বনেই! এই যে জলাশয়, কৃষ্ণাংগ উপজাতি বৃদ্ধেরা এ বিষয়ে একমত যে তাঁরই বজ্রাঘাতে এক ঝলক অগ্নির উদ্গীরণ বশতই একটা গভীর গর্তের সৃষ্টি হয়েছিল এবং কালক্রমে জলে পূর্ণ হয়ে সেই গর্তই এই জলাশয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরই কূলে এক বৃক্ষতলে আছে একখানা বৃহৎ কালো পাথর, তার গায়ে লাল, নীল নানা রংয়ের আলপনা। ইনিই পরমেশ্বর বোংগা। এঁরই পূজার জন্য কৃষ্ণাংগ জনতা মাসান্তে একদিন করে এই জলাশয়ে আসতে বাধ্য হয়। সারাদিন পূজার উৎসবে মেতে থাকে, সন্ধ্যার ভিতরই ফিরে যায় অদূরবর্তী গ্রামের গৃহে। আজও পূজার মেলা আগেই ভেঙে গিয়েছে। গ্রামবাসীরা অনেকে ফিরে গিয়েছে গ্রামে। বাকী সবাই ফিরবার উদ্যোগ করছে।

ধারেকাছে কৃষ্ণাংগদের অস্তিত্ব সম্পর্কে লেফটেনান্ট কার্পেন্টিয়ার কিছুই জানেন না। তিনি দেয়ার্নোকে ধারে কাছে দেখতে পেলেন না। অন্ধকার হয়ে এসেছে দেখে তিনি বিউগিল বাজিয়ে দিলেন—আজকার মতো খোঁজাখুঁজির শেষ হলো, এখন এইখানেই ছাউনি পড়বে রাত্রির মতো। সকলে এখন সেই কাজে হাত লাগাও।

হাত লাগাবার আগে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো নাম-ডাকা। দলের সমস্ত সৈনিক সশরীরে হাজির আছে কিনা, নাম ডেকে ডেকে মিলিয়ে দেখা। এ কাজ কার্পেন্টিয়ারই করে থাকেন। তিনি কাজের শুরুতেই নাম ডাকলেন লেফটেনান্ট দেয়ার্নোর।

লেফটেনান্ট দেয়ার্নো! লেফটেনান্ট দেয়ার্নো!

কোনো সাড়া নেই কোনো দিক থেকে।

চিন্তার কথা! ভয়ের কথা! বিপদের কথা! তিনি গেলেন কোথায়? ঐ অসমসাহসী বীর দেয়ার্নো? জনে জনে জিজ্ঞাসা করে কার্পেন্টিয়ার এইটুকুমাত্র তথ্য আবিষ্কার করলেন যে বেলা পাঁচটার পরে কোনো সৈনিকই চর্মচক্ষে দেখেনি দেয়ার্নোকে। তবে কি তিনি হারিয়ে গেলেন?

খুবই ভয়ের কথা। রাত্রির অন্ধকারে একা তিনি যাবেন কোথায়? কেনই বা যাবেন? সাময়িক শৃংখলার একান্ত পরিপন্থী এমন কাজ। দেয়ার্নোর মতো দায়িত্বশীল অফিসার এমন কাজ করবেন, এ তো অসম্ভব!

ছাউনি পড়লো, আগুন জ্বালানো হলো। পাহারা বসলো। রান্না-খাওয়া সব শেষ। তবু দেয়ার্নোর খোঁজ নেই। রাইফেল থেকে গুলি ছুটছে, বিউগিল বেজে বেজে উঠছে, কিন্তু সাড়া নেই দেয়ার্নোর।

আমরা দেখেছি টারকোজের কবল থেকে জেন পোর্টারকে মুক্ত করেছিল টারজান। তারপর তাকে বিশ্রাম দেবার জন্য মহারণ্যের কোলে লুকোনো দমদমার মাঠে পাতার কুঁড়ে বানিয়ে দিয়েছিল। আরও দেখেছি, তৃতীয় দিনে প্রত্যূষেই টারজান আবার শূন্যপথে যাত্রা করল জেনকে পিঠে নিয়ে। এবারে সমুদ্র-সৈকতের দিকে। মহাবিটপীদের শীর্ষে শীর্ষে বায়ুবেগে ধাবিত টারজান। জেন ভয়ে কাঠ হয়ে আছে, কখন টারজানের পিঠ থেকে ফসকে শত ফুট নিচে মাটিতে পড়ে যায়। গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে মিশে যায় মাটির সংগে।

বায়ুবেগে ছুটেও পারল না টারজান সন্ধ্যার আগে কেবিনের কাছে পৌঁছতে। কেবিন থেকে একটু দূরেই গাছ থেকে নামল টারজান। ঐ দেখা যায় কেবিনের আলো। জেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। যাক, তাকে ফিরে পাবার আশা ত্যাগ করে বাবা তাহলে দেশে ফিরে যাননি ইতিমধ্যে।

জেন এবার বিদায় নিচ্ছে টারজানের কাছ থেকে। যে কোনো ভাষাই বোঝে না, বলতেও পারে না কোনো বোধগম্য ভাষা, তার কাছে কৃতজ্ঞতা কেমন করে জানানো যায়? জেন তো ভেবেই পায় না। অবশেষে আশ্রয় নিতে হলো সেই সনাতন ইশারার।

কতক্ষণ চলতো তাদের মৌন আদানপ্রদান, বলা যায় না। কিন্তু মিস্টার ফিলান্ডারের আবির্ভাবে ছেদ পড়ল এতে। তিনি তাদের দিকেই আসছেন। একে বার্ধক্যবশতঃ দৃষ্টি ক্ষীণ, তায় আঁধারও প্রতিমুহূর্তে হয়ে আসছে নিবিড় থেকে নিবিড়তর। ফিলান্ডার প্রথম দিকে বুঝতেই পারেননি যে তাঁদের হারিয়ে যাওয়া মেয়ে তাঁর ঠিক সমুখেই দাঁড়িয়ে আছে।

বিদায়পর্ব সংক্ষেপ করে টারজান অতঃপর নিকটতম গাছটিতেই তড়তড় করে উঠে পড়ল। ফিলান্ডার এসে পড়লেন জেন-এর একেবারে নিকটে। তবু তিনি দেখতে পাননি জেনকে। জেনই ডেকে উঠল "কাকা" বলে।

একটা ভয়ানক চমক খেলেন ফিলান্ডার এইবার। জেন-এর কণ্ঠস্বর না? জে-এ-ন? সে তো হারিয়ে গিয়েছে। হয়তো মরেই গিয়েছে। সে কেমন করে কথা কইবে? দেহ থাকলে তবে তো কথা কওয়া? বিজ্ঞানী মানুষ ফিলান্ডার। মরে গেলেও হয়তো আত্মা বলে একটা জিনিস থাকলেও থাকতে পারে। এ পর্যন্ত এই বৃদ্ধ বিজ্ঞানী মেনে নিলেও নিতে পারেন। কিন্তু সে আত্মা দেহধারণ করে জীবৎকালের বন্ধুদের সঙ্গে কথা কইবে আবার, এতখানি আজগুবি ব্যাপার তিনি পরিপাক করতে পারেন না কখনও। তাই, জেনকে জেন বলে সন্দেহ হলেও জেন বলে মেনে নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তিনি কাঁপা গলায় দুরুদুরু বুকে প্রশ্ন করলেন– "কে?"

এর উত্তরে জেন ছুটে এসে একেবারে তাঁকে জড়িয়ে ধরল– "আমায় চিনতে পারছেন না কাকা?"

"জেন?"

না, ছায়া তো নয়, দস্তুরমতো কায়া। রক্তমাংসের দেহ! তখন বুড়ো বিজ্ঞানীর চোখের জল আর বাঁধ মানে না।

উভয়ের কথা আর শেষ হয় না। জেন শুনল তাকে খুঁজতে বেরিয়েছে এক সন্ধানী পার্টি। তার বাবা ও ক্লেটনও আছে সেই দলে। কথাবার্তা স্বভাবতঃই সেই পার্টির বিপর্যয়ের দিকে মোড় নিয়েছে। টারজান অবশ্য ওঁদের কথা বুঝতে পারছে না। কিন্তু ওদিকে ফিলান্ডারের কথা, এদিকে জেন-এর। দুই তরফ থেকেই কথা এবং হা-হুতাশ শুনে শুনে একটা ধারণা ক্রমশঃ শিকড় গেড়ে বসেছে টারজানের মনে। সে ধারণা এই যে, কোনো কিছু সাংঘাতিক বিপদই ঘটে থাকবে সন্ধানী দলটার।

কিন্তু কী যে ঘটেছে, তা কে বোঝাবে টারজানকে? বোঝাবেই বা কী উপায়ে? নিচে ওরা দুজনে সবই খোলাখুলি আলোচনা করছে, এটা বোঝা যায়। কিন্তু ভাষা না জানলে আলোচনার বিষয়টা তো বোঝা যায় না।

তবে–হ্যাঁ, বিচারবুদ্ধি বলে জিনিসটা প্রচুরই আছে টারজানের। সে বিচার করে দেখল, জেন এবং ঐ বুড়োর কথাবার্তা রীতিমত উত্তেজনার দ্যোতক, সাধারণ শিষ্টালাপের আভাস ওতে নেই। ভাষা না জেনেও টারজান বুঝতে পেরেছে যে তার অগোচরে এই কেবিনের বর্তমান অধিবাসীরা ঘোরতর একটা কোনো অসুবিধার কিংবা জীবন-মরণ সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। সেই অসুবিধার বা সংকটের বিষয়টাই ঐ বুড়ো জানাচ্ছে জেনকে। জেন তো তিন দিন পরে আজ পুনর্মিলিত হয়েছে তার আপনজনদের সঙ্গে, সুতরাং এই তিন দিনে এখানে কোনো কিছু ঘটে থাকলে তা জেন-এর জানবার কথা নয়।

বিচারবুদ্ধি তাকে আরও বেশ কিছুদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। এরা সব সাদা মানুষ, ছাপার হরফের MAN, বইয়ের MAN-এর মতো রং এদের, পোশাকও তাই। এখন সাদাদের শত্রু হলো কালোরা, গোমাঙ্গানি বলে যাদের জানে টারজান। তা এই টারমাঙ্গানি বা সাদাদের কোনো শত্রুতা যদি গোমাঙ্গানিরা এই তিন দিনের মধ্যে করে থাকে, তবে অবশ্যই তা করে থাকবে নিকটতম গোমাঙ্গানিরা, যাদের বাসস্থান হলো ম্বোঙ্গার গ্রাম। সে গ্রামে এর আগেও দুই একবার গিয়েছে টারজান। ম্বোঙ্গার ছেলে কুলোঙ্গাকে যমালয়ে পাঠাতে একবার, আর তারপর তীরধনু হাতসাফাই করবার জন্যও দুই-একবার।

সেই ম্বোঙ্গার গ্রামে–

এই সমুদ্রপার থেকে আগত সাদা MAN কয়টির যদি কোনো বিপদ ঘটে থাকে–

ঘটার আটক কী? এরা হয়তো জঙ্গলে ঢুকেছিল, ওরা হয়তো জঙ্গলে শিকার করছিল। দেখতে পেয়েছে, ধরে নিয়ে গিয়েছে, পুড়িয়ে খেয়ে ফেলেছে বা ফেলবে। এরকমটাই যদি সত্যি সত্যি ঘটে থাকে, অবাক হওয়ার তো কিছু নেই!

বিচারবুদ্ধি বলছে, এরকম কিছু নিশ্চয়ই হয়েছে, তা নইলে এরা এত চঞ্চল কেন? কিন্তু কী অনর্থ ঘটেছে, কী করলে তার কিয়ৎপরিমাণও প্রতিকার বা ক্ষতিপূরণ হতে পারে, তা এখানে বসে থেকে টারজান তো জানতে পারবে না! দিনের পর দিন রাতের পর রাত এই সমুদ্র-সৈকতে পাহারা দিতে থাকলেও পারবে না জানতে। বিচারবুদ্ধি বলে, জানবার উপায় আছে একটা মাত্র। এক দৌড়ে ম্বোঙ্গার গ্রামটা দেখে আসা। দেখে আসা যে সেখানে কোনো সাদা মানুষকে পুড়িয়ে খাওয়ার জন্য আগুন জ্বালা হয়েছে কিনা। জ্বলছে কিনা আগুন! জ্বালা হয়েছিল গতকাল বা গত পরশু, এমন কিছু দেখা যায় কিনা কোথাও।

গেলেই জানা যায়। গাছে উঠেই তো বসে আছে টারজান। গাছে গাছে লাফাতে লাফাতে ম্বোঙ্গার গ্রামে পৌঁছোতে কতক্ষণ লাগবে আর? এক অসুবিধা, সময়টা রাত্রি। তা তার জন্য কোনো অসুবিধা টারজানের হওয়ার কথা নয়। অন্য লোকের পক্ষে অসুবিধা তো হতেই পারে, এমন কি অসম্ভবও হতে পারে তা। কিন্তু টারজানের চোখ অন্ধকারেও জ্বলে, চিতার চোখের মতো, সিংহের চোখের মতো। অন্ধকারেও গাছ থেকে গাছে লাফালাফি করা অভ্যাস আছে ওর, সহস্রবার করেছে, কখনও পা ফসকায়নি তার।

আঁধার রাতে, সন্‌সন্‌ বায়ু বইছে আকাশে, ঘুমুল কলরোলে তরঙ্গ ভাঙছে সমুদ্রের বুকে। ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ অরণ্য পায়ের তলায় মথিত করে ধেয়ে চলেছে টারজান ম্বোঙ্গার গ্রামে, কেবিন থেকে যার দূরত্ব কমপক্ষে পঞ্চাশ মাইল হবে। দূরত্বটার আন্দাজ আছে টারজানের, যদিও এ-পথে নৈশ পর্যটন তাকে আগে কোনোদিন করতে হয়নি।

সন্ধ্যা সবে ঘোর হয়ে নেমেছে। টারজান ছুটতে শুরু করেছে শূন্যপথে। কিন্তু দূর থেকে কানে আসে এ কিসের আওয়াজ? রাইফেলের কি?

[চলবে]

ছবি: নারায়ণ দেবনাথ

ছদ্মবেশে ম্যাম'জেল এক্স (গত সংখ্যার পর)

জেনারেলের সহচর ক্যাপ্টেন গাড়ি থেকে নামলো
ও যে হেনরির সঙ্গে কথা বলছে ?
এটার কতো দাম ?
মঁশিয়ে এটা তো বিক্রির জন্যে নয় !
ঠিক আছে মঁশিয়ে আপনি যখন কোনো কথা শুনবেন না তখন ছবিটার জন্যে এক হাজার ফ্রাঁ দিন।
এ তো ডাকাতি ! নেহাত কম্যাণ্ডার আমায় হুকুম দিয়েছেন, তুমি যা দাম চাইবে তাই দিতে··· নাহ'লে ছবিটা এমনি তুলে নিয়ে যেতাম।
আমার নতুন অফিসের দেওয়ালে ছবিটা দারুণ মানাবে।
বাজে কথা বোল না ফরাসি চর—বিক্রি করতে চাও না ··· ঠিক আছে আমি এই ছবিটা আমাদের নাৎসি বাহিনীর নামে বাজেয়াপ্ত করলাম !
গাড়িটা চলে যেতেই ম্যাম'জেল এগিয়ে এলো।
সর্বনাশ হয়ে গেলো ···
কেন ? কি হয়েছে ··· ছবিটা এমন কিছু দেখতে নয় ··· তুমিও তো হাজার ফ্রাঁ পেয়ে গেলে। তাহ'লে আবার সর্বনাশটা কিসের ?
[চলবে]

সত্যি !

অলৌকিক

তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। একদিন রাতে অতর্কিত আক্রমণে বৃটিশ বিমানবাহিনী ধ্বংস করে দিল জার্মানীর হ্যামবার্গ শহরের শিপ ইয়ার্ডটাকে। ইংলন্ডে বসে কাগজে সেই কাহিনী পড়ে স্তম্ভিত হয়ে যান জে. বার্নার্ড হাট্‌ন। বহুকাল আগে ওই শহরেই থাকতেন তিনি। কাজ করতেন এক সংবাদপত্রের অফিসে। একবার তাঁকে আর ফটোগ্রাফার জোয়াচিম ব্রান্ডট্‌কে পাঠানো হয়েছিল ওই শিপ ইয়ার্ডেই ওখানকার কাজকর্ম দেখে ছবি তুলে আনার জন্য। তাঁরা যখন কাজ সেরে বেরিয়ে আসছিলেন ঠিক তখনি তাঁদের কানে এসেছিল অনেকগুলো স্লেনের শব্দ আর তার সঙ্গে বিমানবিধ্বংসী কামানের গর্জন। হঠাৎই তাঁদের চারপাশে নেমে এসেছিল ঘোর অন্ধকার। অবিশ্রান্ত বোমাবর্ষণে আগুন জ্বলে উঠেছিল চারদিকে। এত সব কান্ডের মধ্যেও জোয়াচিম তাঁর ছবি তোলা বন্ধ রাখেননি।

যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে মনে করে তাঁরা তাড়াতাড়ি শহরে ফিরে এসেছিলেন। সেখানে পৌছে দেখেছিলেন কোথায় অন্ধকার ! গোটা শহর রোদে ঝলমল করছে। ফিল্ম ডেভলাপ করতেও আরেক বিস্ময়। বোমাবর্ষণের চিহ্নমাত্র ছবিতে নেই। শিপ ইয়ার্ডের দিব্যি সব ভালো ভালো ছবি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিমান আক্রমণের কাহিনী পড়ে হাট্‌ন বুঝতে পারলেন উনিশশ' তেতাল্লিশ সালে যা ঘটবে তা তাঁরা দেখে ফেলেছিলেন এগারো বছর আগেই। কেমন করে এ অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল ? হাট্‌নের নিজেরও তা জানা নেই। তবে দেখেছিলেন যে ঘটনাটা সে বিষয়ে তিনি একশ ভাগ নিশ্চিত।

একেই বলে নিয়তি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পিটার কারপিন নামে একজন জার্মান গুপ্তচর ফ্রান্সে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সে দেশের গোয়েন্দাদের হাতে ধরা পড়ে। গোয়েন্দা বিভাগ তিন বছর ধরে কারপিনকে আটকে রেখে তার জার্মান কর্তাদের ভুল খবর পাঠাতে থাকে আর ফ্রান্সে তার জন্য পাঠানো সমস্ত টাকা বাজেয়াপ্ত করে। শেষমেষ ১৯১৭ সালে কারপিন বন্দীদশা থেকে পালাতে সক্ষম হয়।

এদিকে গোয়েন্দা বিভাগ কারপিনের টাকায় একটা গাড়ি কেনে। সেই গাড়ি ১৯১৯সালে ফ্রান্স অধিকৃত রুহর অঞ্চলে একটি লোককে চাপা দিয়ে মেরে ফেলে। নিছক দুর্ঘটনা। কিন্তু যে লোকটি মারা যায় সে আর কেউ নয় পিটার কারপিন। পালিয়েও সে নিজেকে বাঁচাতে পারল না।

ছবিঃ রজতবরণ চক্রবর্তী

গ্রহান্তর থেকে ফিরে

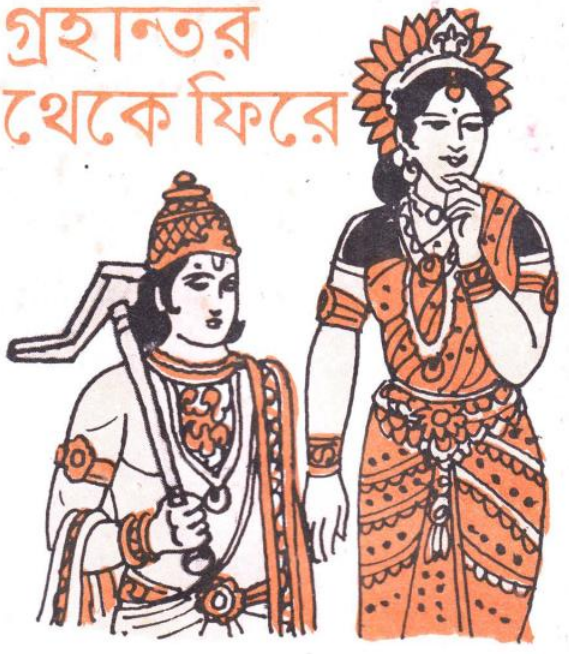

নন্দলাল ভট্টাচার্য

শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয়ে গেল বলরামেরও। কিন্তু বিয়েটা হলো যেন এক গ্রহান্তরের প্রাণীর সঙ্গে। বউ লম্বায় বলরামের চেয়ে হাত চারেক বেশি। তার ওপর বয়সটাও তার প্রায় ১৪ কোটি বছরের মতো।

ব্যাপারটা আজগুবি মনে হলেও বলরামের কপালে তাই হলো। তার বউ রেবতী জন্মেছিল সেই সত্যযুগে। কিন্তু বাবার সঙ্গে ব্রহ্মলোকে একটা দিন কাটানোর ফাঁকে যে এতগুলো বছর পরে হয়ে যাবে সেটা রেবতী যেমন বোঝেনি, তেমনি বোঝেনি তার বাবা রৈবত ককুদ্মীও। যদি বুঝতেন তাহলে কী এমন বেআক্কেলে কাজটা করতেন?

তবে একটা রক্ষে, আজকে যাকে 'টাইম এন্ড স্পেস থিওরি' বলা হয় সেই সূত্র অনুযায়ী পৃথিবীর বয়সের হিসেবে প্রায় ১৪ কোটি বছর পরে হলেও গ্রহান্তরে থাকার জন্য তাঁদের বয়সটা বেড়েছিল সেখানকার নিয়মমত মাত্র একদিনই। চেহারারও কোনো পরিবর্তন হয়নি। বলা যায়, বয়সটা তাঁদের ওই এক জায়গাতেই থেমে ছিল।

গোলমালটা বাধল পৃথিবীতে ফিরে। বয়স ঠিক থাকলেও সত্যযুগের মানুষ বলে তাঁরা ছিলেন সাড়ে সাত আট হাতের মতো লম্বা। অথচ দ্বাপরের শেষে মানুষ বেঁটে হতে হতে নেমে এসেছে চার সাড়ে চার হাতে। তাই বিয়ের সময় বলরামের পাশে যখন তার বউ রেবতী দাঁড়াল তখন সবাই মিলে শুরু করে দিল নানা রকম হাসি ঠাট্টা। বলতে থাকল তালগাছ বউয়ের নটেগাছ স্বামী।

সে সব হাসি ঠাট্টায় রেবতীর চোখ মুখ লাল হয়ে উঠছে দেখে বলরাম বলে উঠলেন, রোসো, এ আমি এখনই সব ঠিক করে দিচ্ছি।

সত্যিই বলরাম ঠিক করে দিলেন। কি ভাবে দিলেন, সেটা বলার আগে বরং রেবতী আর তার বাবা গ্রহান্তরে গিয়ে কি ভাবে বয়সটাকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন সেটাই বলে নেওয়া যাক।

সেটা সত্যযুগের কথা। সে যুগে শর্যাতি বলে এক রাজা ছিলেন। শর্যাতির মেয়ে সুকন্যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল মহর্ষি চ্যবনের। আর ছেলে আনর্ত পরে বসেছিলেন বাবার সিংহাসনে। আনর্তের ছেলের নাম রেবত। কুশস্থলী বলে একটা জায়গায় সমুদ্রের মধ্যে এক পুরী তৈরি করেন তিনি। এই রেবতেরই ছেলে রৈবত ককুদ্মী আর তাঁরই মেয়ে রেবতী।

রাজা রেবতের ছিল একশ ছেলে। তাদের মধ্যে সব দিক থেকে শ্রেষ্ঠ ছিল রৈবত ককুদ্মী। তাই তিনিই বসেছিলেন সিংহাসনে।

সেই সত্যযুগে প্রতিটি মানুষেরই স্বাস্থ্য ছিল খুব ভাল। বাঁচতও সবাই কম করে হাজার বছর। দেখতেও সব যেন এক একজন রাজপুত্র। কাজেই রেবতী যে স্বাস্থাবতী হবে তাতে আর আশ্চর্য কী? রাজার মেয়ে বলে রেবতী ছিল আবার অসাধারণ সুন্দরী।

মেয়ে বড় হয়ে উঠতেই রাজা পড়লেন ভাবনায়। এমন সুন্দরী মেয়ের বিয়ে তিনি দেবেন কার সঙ্গে। সারা পৃথিবী ঘোরার পর জনা পাঁচ-ছয় পাত্র তাঁর মনে ধরল। এরা সবাই যাকে বলে একবারে সমান সমান। কাকে ছেড়ে কার সঙ্গে যে মেয়ের বিয়ে দেবেন, তাই নিয়ে রাজা পড়লেন মহা ভাবনায়। কিছুতেই তিনি এদের মধ্য থেকে একজনকে বেছে নিতে পারলেন না।

পাত্র বাছাই করতে না পেরে রাজা ভাবেন, তাহলে বরং একবার ব্রহ্মলোকে পিতামহ ব্রহ্মার কাছে যাওয়া যাক। তিনি যে পাত্র বেছে দেবেন তারই সঙ্গে বিয়ে দেবেন মেয়ে রেবতীর।

যেমন ভাবনা তেমনি কাজ। রেবতীকে বললেন রাজা, চ'মা, একটু ব্রহ্মলোকে গিয়ে পিতামহ ব্রহ্মার সঙ্গে দেখা করে আসি।

বাবা যে কিজন্য ব্রহ্মলোকে যাচ্ছেন, তা রেবতী বেশ ভালই জানে। তাই কোনো প্রশ্ন না করে সে সঙ্গ নেয় বাবার।

ব্রহ্মলোকে গিয়ে রৈবত ককুদ্মী দেখেন পিতামহের সামনে তখন বসেছে গানের আসর। হা-হা আর হুহু বলে দু'জন গন্ধর্ব অপূর্ব সুরলহরী বিস্তার করে চলেছে আর পিতামহ ব্রহ্মা ধ্যানস্থ হয়ে শুনছেন তা।

রৈবত ককুদ্মী কোনো কথা না বলে মেয়েকে নিয়ে বসে পড়লেন সেখানে। সেই অপূর্ব গান শুনতে শুনতে তিনি সবকিছু ভুলে গেলেন। তারা-উদারা-মুদারায় যখন দুই গন্ধর্ব

আপনার কাছে এসেছি।

গলা ওঠাচ্ছে নামাচ্ছে তখন যেন সুধা ঝরে পড়তে থাকে।

একটু পরেই গান থামায় হা-হা আর হুহু। সঙ্গে সঙ্গে রৈবত কুকুদ্মীর হৃদয়টা হায় হায় করে ওঠে। তিনি ভাবেন, কেন আরও একটু আগে এলুম না। তাহলে তো আরও কিছুক্ষণ শুনতে পেতাম এই গান। আহাহা, জীবন আজ আমার সার্থক হলো।

গান থামতে ধ্যান ভাঙল ব্রহ্মারও। রৈবত কুকুদ্মী আর তাঁর মেয়ে রেবতীকে দেখে ব্রহ্মা বলেন, কী ব্যাপার, তোমরা কী মনে করে?

রৈবত কুকুদ্মী প্রণাম করে বলেন, বড় সমস্যায় পড়ে আপনার কাছে এসেছি।

ব্রহ্মা মুচকি হেসে বলেন, তোমার আবার কী সমস্যা হলো?

সমস্যা এই মেয়েকে নিয়ে।

রেবতীর দিকে তাকিয়ে ব্রহ্মা বলেন, কেন, মেয়ে তো তোমার ভারি লক্ষ্মী।

না, না, তা বলছি না। মেয়ে আমার ভারি লক্ষ্মী। কিন্তু এবার তো ওর বিয়ে দিতে হবে।

ব্রহ্মা হেসে বলেন, তা তো দিতে হবেই। সে তো সবাই দেয়। তা এতে তোমার আবার সমস্যাটা কী?

রৈবত কুকুদ্মী এবার একটু বিশদ হয়ে বলেন, আমি জনা পাঁচ ছয় পাত্রকে বেছেছি। কিন্তু কার সঙ্গে যে মেয়ের বিয়ে দেব সেটাই বুঝতে পারছি না। তাই আপনার কাছে এলাম। আপনি যাকে বেছে দেবেন তার সঙ্গে বিয়ে দেব রেবতীর।

ব্রহ্মা আবারও হেসে বলেন, তা কাকে কাকে পছন্দ করেছ তুমি বল। দেখি কাকে বাছা যায়।

পিতামহের কথায় রৈবত কুকুদ্মী এক এক করে নাম বলে যান সবার। সে সব নাম শুনে ব্রহ্মা হো হো করে হেসে উঠেন।

ব্রহ্মাকে অমন করে হাসতে দেখে একটু ভড়কেই যান রৈবত কুকুদ্মী। বলেন, কী হলো পিতামহ, আপনি হাসছেন কেন?

হাসব না, তুমি বলছ কী বাপু?

কেন?

কেন আবার? বলি ওরা কী বেঁচে আছে? ওরা কেন, ওদের নাতিপুতিও এখন বেঁচে নেই। সত্য, ত্রেতা পার হয়ে পৃথিবীতে এখন শেষ হতে চলেছে দ্বাপর যুগ।

এবার রৈবত কুকুদ্মীর অবাক হবার পালা। তিনি বলেন, কী বলছেন আপনি? এই তো আমি এলাম আপনার এখানে। একটুখানি গান শোনার পরই তো আপনাকে বলছি সব।

বাপু হে, তোমার ওই একটুখানি সময়ের মধ্যে পার হয়ে গেছে ব্রহ্মলোকের প্রায় একটা দিন আর পৃথিবীর পার হয়ে গেছে আঠাশটা মন্বন্তর—অর্থাৎ প্রায় ১৪ কোটি বছর।

বিস্মিত রৈবত কুকুদ্মী বলেন, তাহলে আমার আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব, বংশ....

ব্রহ্মা হেসেই বলেন, না, তারা কেউই বেঁচে নেই।

কথাটা শুনে রৈবত কুকুদ্মী রীতিমত মুষড়ে পড়ে বলেন, তাহলে?

ব্রহ্মা বলেন, ঘাবড়িও না। জন্মালে মানুষকে মরতে হবেই। পাপক্ষয়ের জন্যই তাদের এই জন্মমৃত্যু। এ ছাড়া ভগবান স্বয়ংও অনেক সময় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। তবে সেটা পাপক্ষয় করার জন্য নয়। পৃথিবীকে পাপমুক্ত করতে। এখন এই দ্বাপর যুগে ভগবান আবির্ভূত হয়েছেন মরলোকে। তোমার রাজধানী ছিল যে কুশস্থলীতে তার নাম হয়েছে এখন দ্বারকা। সেই দ্বারকায় এখন ভগবান শরীর ধারণ করে আছেন বলরাম নামে। তুমি তাঁরই হাতে তুলে দাও তোমার মেয়েকে। বলরামই রেবতীর যোগ্য স্বামী।

রৈবত কুকুদ্মী তখন ব্রহ্মাকে প্রণাম করে মেয়েকে নিয়ে আবার ফিরে আসেন পৃথিবীতে। দেখেন সত্যিই সব কিছু কেমন যেন বদলে গেছে। মানুষগুলো সব বেঁটে বেঁটে দুর্বল। তাঁদের মতো লম্বা স্বাস্থ্যবান একজনও নেই। তাই তাঁদের দিকে সবাই যেন কেমন অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে।

মনটা খারাপ হয়ে যায় রৈবত কুকুদ্মীর। তবুও তিনি চলে আসেন দ্বারকায়। দ্বারকায় এসে বলরামকে দেখে মনটা আবার যেন আনন্দে ভরে উঠল। তাঁদের তুলনায় অনেক বেঁটে হলেও বলরামকে দেখতে খুবই সুন্দর। বুকটা একবারে স্ফটিকের মতো সাদা। আজানুলম্বিত বাহু, কাঁধের ওপর রয়েছে হল বা লাঙল।

বলরামকে দেখে রৈবত কুকুদ্মী মনে মনে বলেন, নাঃ, বলরাম তাঁর মেয়ে রেবতীর স্বামী হওয়ারই যোগ্য।

রাজা এবার ব্রহ্মার আদেশে বলরামের সঙ্গে মেয়ে রেবতীর বিয়ে দিয়ে হিমালয়ে চলে গেলেন তপস্যা করতে।

বিয়ের পর সবাই ঠাট্টা করতে লাগল অমন লম্বা বউয়ের জন্য। বিশেষ করে কৃষ্ণ। তার ঠাট্টাতেই অস্থির হয়ে বলরাম বলেন, অত হাসার কী আছে? এখনি আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।

এই না বলে কাঁধ থেকে লাঙলটা নিয়ে বলরাম সেটাকে আঁকশির মতো রেবতীর কাঁধে চেপে ধরে নিচের দিকে টানতে থাকলেন। কৃষ্ণ যেই বললেন ব্যস, অমনি লাঙল নামিয়ে নিলেন বলরাম। সবাই অবাক হয়ে দেখল, অপূর্ব মানিয়েছে দুটিকে। কে বলবে একটু আগে রেবতী ছিলেন অত লম্বা। যাই হোক, সেদিন থেকে বলরামের আরেকটা নাম হলো রেবতীরমন রাম।

কাহিনী সূত্র বিষ্ণুপুরাণ

ছবি: সুফি

পুরস্কার

গৌরী সেন

ছোট্ট সুন্দর রাজ্য উদয়নগর। রাজা উদয়সিংহের বিশেষ কিছু ধন-সম্পত্তি নেই। তবে তাঁর সুখ-শান্তি আছে। রানী নিজের হাতে রান্না করে রাজাকে যত্ন করে খেতে দেন। রাজ্যের লোক রাজাকে ভালবাসে আর রাজাও প্রজাদের ভালবাসেন, তাদের দুঃখ-কষ্ট দেখেন, শোনেন।

রাজার সবচেয়ে বড় আনন্দ তাঁর একমাত্র মেয়ে কমললতা। রাজকন্যা ঘুরে বেড়ান, যেন চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়ে। যখন সখীদের সঙ্গে খেলা করেন তখন সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। তাঁর গলার মিষ্টি গান শুনে সবার মন আনন্দে ভরে যায়। রাজকন্যার মনটিও ভারি নরম। কারুর কষ্ট দেখলেই তাঁর চোখে জল আসে।

কিন্তু রাজা উদয়সিংহের এ সুখ বেশিদিন সইল না। তাঁর রাজ্যের পাশেই ছিল রামনগরের রাজা বিশ্বপ্রতাপের বিশাল রাজ্য। রাজা বিশ্বপ্রতাপের অনেক ধন-সম্পত্তি। তাঁর হাতিশালে অনেক হাতি, ঘোড়াশালে অনেক ঘোড়া, অনেক দাসদাসী। কিন্তু ভারি লোভ তাঁর। বিশেষ করে ছোট্ট সুন্দর উদয়নগর রাজ্যটি তাঁর চাই-ই। ও রাজ্যটা নিজের রাজ্যের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে না পারলে কিছুতেই তিনি শান্তি পাচ্ছেন না।

একবার অনেক সৈন্যসামন্ত, হাতি-ঘোড়া নিয়ে তিনি উদয়নগরের দিকে এগোলেন। যেই উদয়নগরের কাছাকাছি এসেছেন, দেখেন কি উদয়নগরের সব সৈন্য আর প্রজারা যুদ্ধ করার জন্য তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের রাজাও এসেছেন যুদ্ধ করতে আর রাজপুরীর সাতমহল থেকে রাজকন্যা তীর ছুঁড়ছেন সাঁই সাঁই, যেন এক একটা বাজ। বাধ্য হয়ে রামনগরের রাজাকে যুদ্ধের আশা ছেড়ে দিয়ে ফিরে যেতে হলো। আরও কয়েকবার তিনি উদয়নগর জয় করার চেষ্টা করলেন কিন্তু কিছুতেই তিনি উদয়নগরের দিকে এগোতেই পারেন না। যতবার যান ততবারই তাঁকে ফিরে চলে আসতে হয়।

উদয়নগরের মানুষরা নিজেদের দেশকে খুব ভালবাসত। যাতে তাদের রাজ্য কেউ কেড়ে নিতে না পারে, তাই সে দেশের সবচেয়ে সেরা কারিগর দেশের চারদিকে সীমানার দূরে-দূরে মাটির নিচে সংকেত যন্ত্র তৈরি করে রেখেছিল। অজানা কেউ সীমানার কাছাকাছি এলেই রাজপুরীর সাতমহলে রাজকন্যার ঘরে সে খবর চলে যেত। রাজকন্যার ঘরের ছাদে জানলায়, দরজায় বাঁধা ছিল ছোট ছোট রুপোর ঘন্টা, সেগুলো একসঙ্গে বেজে উঠত। সঙ্গে সঙ্গে রাজকন্যা ছুটে যেতেন রাজার কাছে আর তখনই রাজ্যের সৈন্যসামন্ত, সব মানুষ তৈরি হয়ে ছুটে চলে যেত রাজ্যের সীমানায়।

এদিকে বার বার উদয়নগরের কাছে গিয়েও রাজ্যটা জয় করতে না পেরে রামনগরের রাজা বিশ্বপ্রতাপ ভীষণ রেগে গেলেন। তিনি রাজপুত্র সঞ্জয়কুমারকে ডেকে পাঠালেন।

রাজপুত্র সঞ্জয়কুমারের অনেক গুণ। তিনি অনেক শাস্ত্র পড়েছেন। তীর ছুঁড়তে আর তরোয়াল নিয়ে যুদ্ধ করতে তাঁর

মতো কেউ পারেন না। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় গুণ তিনি সুন্দর বীণা বাজান। তাঁর বীণা শুনে বনের পশু-পাখিও চুপ করে দাঁড়িয়ে যায়।

রাজপুত্র সঞ্চয়কুমার এলে, রাজা বললেন–রাজপুত্র তুমি এখন বড় হয়েছ। এবার তোমাকে একটি কাজের ভার দেব।

–কি কাজ বাবা?

–দেখ, আমি যতবারই উদয়নগর জয় করতে যাই, ততবারই ফিরে আসি।

–কেন?

–গিয়ে দেখি উদয়নগরের রাজা সব সৈন্যসামন্ত ও প্রজাদের নিয়ে রাজ্যের সীমানার কাছে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। স্বয়ং সুন্দরী রাজকন্যা সাতমহলের মাথার উপর থেকে তীর ছুঁড়ছে। আমি ভেবে পাই না, আমরা সীমানার কাছে পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই ওরা খবর পায় কি করে? রাতের অন্ধকারে যত চুপচাপই যাই না কেন ঠিক খবর পেয়ে যাবেই।

–তা ওদের তো অল্প সৈন্য, রাজ্যও তো খুবই ছোট, ওদের হারিয়ে দিতে কতটুকু সময় লাগবে। রাজপুত্র বলেন।

–রাজপুত্র কাজটা যত সোজা মনে করছ তত সোজা নয়। ছোট্ট রাজ্য হলে কি হবে, ওদের প্রত্যেকটি মানুষ খুব বীর। ওদের এক একজন মানুষ আমাদের একশ জনের সমান। তাছাড়া ওরা যে দেশকে ভীষণ ভালবাসে।

–ঐটুকু দেশকে জয় করে আমাদের কি লাভ। থাক না ওরা শান্তিতে নিজেদের রাজ্যে, আমাদের তো ওরা কোনো ক্ষতি করেনি।

রাজা বিশ্বপ্রতাপ পুত্রের কথা শুনে খুব রেগে যান। বলেন–চুপ কর। আমার আদেশ তোমাকে যেমন করেই হোক খোঁজ নিতে হবে কি করে ওরা জানতে পারে। তারপর উদয়নগরকে হারিয়ে রাজ্যটা আমাদের রামনগর রাজ্যের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে তোমাকেই।

–বেশ, আমি যাচ্ছি।

–হ্যাঁ, যাও। তবে মনে রেখ উদয়নগর জয় করতে না পারলে তোমাকে আমি নির্বাসন দন্ড দেব।

রাজপুত্র রাজপুরীতে ফিরে রানী বাসন্তীর ঘরে এলেন।

–মা, আমাকে এখনই উদয়নগর যেতে হবে।

–কেন? রানী জিজ্ঞাসা করেন।

–বাবার আদেশ উদয়নগর জয় করে ফিরে না আসতে পারলে, তিনি আমাকে রাজ্য থেকে নির্বাসন দেবেন।

–সে কী? এত লোভ তাঁর!

–ওসব কথা থাক মা, তুমি এখন আমাকে আশীর্বাদ কর।

রানী চোখের জলে ছেলেকে আশীর্বাদ করেন।

রাজপুত্র সঞ্চয়কুমার নিজের মহলে এলেন। খুলে ফেললেন রাজপুত্রের সাজসজ্জা। গেরুয়া কাপড় পরে সন্ন্যাসী সেজে তিনি রওনা হলেন উদয়নগরের পথে। হাতে তাঁর প্রিয় বীণাটি কিন্তু আছে।

যেই উদয়নগরের সীমানার কাছাকাছি পৌঁছেছেন সঙ্গে সঙ্গে দেখেন রাজ্যের ধারে ধারে যেসব প্রহরীরা ছিল সবাই ছুটে এসেছে।

–কি চাই? কে আপনি?

–দেখতেই তো পাচ্ছ আমি একজন সন্ন্যাসী। আমি আমার বীণায় ভগবানের গান গাই আর দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই।

–বেশ, আপনি আমাদের রাজার কাছে চলুন, তাঁকে আপনার বাজনা শোনাবেন।

–চল।

সন্ন্যাসীকে নিয়ে প্রহরীরা রাজার কাছে এল। রাজা সব শুনে বললেন–বীণা বাজিয়ে আমাদের শোনান সন্ন্যাসী ঠাকুর।

রাজপুত্র সঞ্চয়কুমার তাঁর বীণা বাজাতে শুরু করলেন। সমস্ত রাজসভা এক মুহূর্তে চুপ করে গেল। কোথাও একটা শব্দ নেই। যেন গভীর রাত্রি। রাজপুরীর ভিতর থেকে রানীমা, রাজকন্যা আরও অনেকে কখন এসে রাজসভায় দাঁড়িয়েছেন কেউ জানে না।

বাজনা থামল। সবাই যেন জেগে উঠল। রাজকন্যা কমললতা রাজার কাছে এসে বললেন–বাবা, আমি এঁর কাছে বাজনা শিখব।

রাজা নিজেও সন্ন্যাসীর বাজনা শুনে খুব খুশি। তিনি বললেন–সন্ন্যাসী ঠাকুর আপনি আমাদের এখানে থাকুন। আর কাল থেকে রোজ খুব ভোরে রাজসভায় আপনার বীণা শোনাবেন। কিন্তু আপনার সবচেয়ে বড় কাজ হবে আমার মেয়ে কমললতাকে বীণা শেখানো। বড় ভাল বীণা বাজান আপনি।

সন্ন্যাসী বললেন–মহারাজ, আমি সন্ন্যাসী, নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াই, বেশিদিন এক জায়গাতে থাকতে পারি না। আর শিষ্যও করি না কাউকে। তবে আপনি যখন বলছেন, তখন আপনার মেয়েকে বীণা শেখাব।

রাজা উদয়সিংহ হেসে বলেন–সন্ন্যাসী ঠাকুর, রাজকন্যা যদি আপনার মতো সুন্দর বীণা বাজাতে পারে তবে আপনি যা চাইবেন সেই পুরস্কারই দেব।

পরদিন থেকে সন্ন্যাসী সঞ্চয়কুমার রাজকন্যাকে বীণা শেখান খুব যত্ন করে। আর রাজকন্যা কমললতাও খুব মন দিয়ে শেখেন। তবে সময় পেলেই সন্ন্যাসী সঞ্চয়কুমার রাজ্যের সব জায়গায় ঘুরে বেড়ান, সব মানুষের সঙ্গে মেশেন। এখন তিনি জেনেছেন কি করে এদেশের মানুষ দেশের সীমানাতে শত্রু এলেই টের পায়। সংকেত যন্ত্রের কথা তিনি শুনেছেন। দেখেছেন রাজকন্যার ঘরের অজস্র ছোট-ছোট সুন্দর রুপোর ঘন্টাগুলো। কিন্তু সঞ্চয়কুমার কিছুতেই ভাবতে পারেন না এদেশের মানুষগুলোর সর্বনাশ করার কথা।

দিন যায়। রাজকন্যা এখন সুন্দর বীণা বাজান। একদিন সন্ন্যাসী সঞ্চয়কুমার রাজকন্যাকে বললেন–আমার যত বিদ্যা

ছিল সব তোমাকে শিখিয়ে দিয়েছি। এবার আমি চলে যাব। তবে গুরুদক্ষিণা হিসাবে আমি একটা জিনিস চাইব।

–বলুন। রাজকন্যা বলেন।

–তোমার ঘরের রুপোর ছোট–ছোট ঘন্টাগুলো সব আমাকে দিতে হবে।

রাজকন্যার মুখ মলিন হয়ে গেল। কিন্তু পিতার প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়াতে তিনি সব ঘন্টাগুলো খুলে সন্ন্যাসীর হাতে দিয়ে বলেন–সন্ন্যাসীর সাজে সেজে থাকলেও তুমি যে সন্ন্যাসী নও তা বুঝতে পেরেছি অনেকদিন আগেই। একটা কথা জানতে চাই, তুমি আমার দেশের সর্বনাশ করতে চাইছ কেন? তুমি কে?

রাজপুত্র সঞ্জয়কুমার বলেন–আমি রামনগরের রাজপুত্র সঞ্জয়কুমার। আমি যদি তোমার দেশ জয় না করতে পারি তাহলে নিজের দেশ থেকে নির্বাসিত হব, আমার পিতা রাজা বিশ্বপ্রতাপের আদেশ।

–তুমি কি তাই করবে? রাজকন্যা প্রশ্ন করেন।

–না, উদয়নগরের সর্বনাশ আমি করতে পারব না। এ দেশটাকে আমি ভালবেসে ফেলেছি। আমি আজই রাতের অন্ধকারে রামনগরে ফিরে যাব। তারপর সন্ন্যাসীর সাজ ছেড়ে রাজপুত্রের সাজে সেজে ঘোড়ায় চড়ে আবার উদয়নগরে ফিরে আসব। যাতে আমার যাওয়া আসা উদয়নগরের লোকেরা জানতে না পারে তাই ঘন্টাগুলো তোমার কাছ থেকে চেয়ে নিলাম।

–তারপর? রাজকন্যা জিজ্ঞাসা করেন।

–ফিরে এসে আমি উদয়নগর রামনগর ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাব। তুমি আমার সঙ্গে যাবে রাজকন্যা কমললতা?

–হ্যাঁ, আমিও তোমার সঙ্গে যাব রাজপুত্র।

–তবে তৈরি থেকো।

এদিকে হয়েছে কি রামনগরের রাজা বিশ্বপ্রতাপ রাজপুত্র সঞ্জয়কুমারকে উদয়নগরে পাঠিয়ে দিয়ে খুবই চিন্তায় পড়েছেন। দিন যায়, মাস যায়, বছর ঘোরে, সঞ্জয়কুমার ফেরেন না। রাজা ভেবে ভেবে দিনে ভাল করে কাজ করতে পারেন না, রাতে ঘুম হয় না। রাজত্ব, ধন-সম্পত্তি ভাল লাগে না। উদয়নগর রাজ্যের জন্য আর তাঁর কোনো লোভ নেই। এখন শুধু রাজপুত্র সঞ্জয়কুমার ফিরে এলেই হয়। রানী বাসন্তী দিনরাত ছেলের জন্য কাঁদছেন।

সেদিন রাতে সঞ্জয়কুমার চুপিচুপি রামনগরে ফিরে এলেন। প্রাসাদে ঢুকে প্রথমে নিজের মহলে গিয়ে বেশভূষা পাল্টে নিলেন। তারপর রানী বাসন্তীর বন্ধ দরজার সামনে প্রণাম করে তেমনি চুপিচুপি ঘোড়া নিয়ে আবার উদয়নগরের দিকে রওনা হলেন।

রাজা বিশ্বপ্রতাপের চোখে ঘুম নেই, তিনি নিজের জানলা থেকে দেখতে পেলেন ছেলেকে। কিন্তু একটু পরেই আবার সঞ্জয়কুমারকে একা ঘোড়া নিয়ে উদয়নগরের দিকে ফিরে যেতে দেখে বুঝলেন সে বোধহয় আর কোনোদিন রামনগরে ফিরতে

রাজা বিশ্বপ্রতাপ বলেন–চুপ কর।

চায় না। তাই এমন চুপিচুপি এসে আবার ফিরে যাচ্ছে। তিনি চট করে নিচে নেমে এলেন। অল্প কিছু সৈন্য নিয়ে তিনিও রওনা হলেন উদয়নগরের দিকে।

উদয়নগরে পৌঁছে রাজা ভাবেন তাই তো, হৈ-হৈ করতে করতে উদয়নগরের সৈন্যসামন্ত ছুটে এল না তো! এল না উদয়নগরের রাজা আর অন্য সব মানুষেরা। রাজকন্যার সাতমহল থেকেও তীর আসছে না সাঁই-সাঁই করে।

রাজা বিশ্বপ্রতাপ তাঁর ছোট্ট সৈন্যদল নিয়ে উদয়নগরে ঢুকে রাজপুরী ঘিরে ফেললেন। রামনগরের সৈন্যদের গোলমালে রাজা উদয়সিংহের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি জানলা দিয়ে বাইরে

যথা আজ্ঞা মহারাজ।

তাকিয়ে অবাক–একি রামনগরের সৈন্য তাঁর রাজপুরী ঘিরে ফেলেছে? এটা কী করে সম্ভব হলো? রাজকন্যার ঘরের ঘণ্টাগুলো বাজেনি? তিনি কোনো খবর পেলেন না কেন?

রাজা উদয়সিংহ ছুটে রাজকন্যার ঘরে এলেন। রাজকন্যার ঘরের ছাদে, জানলায়, দরজায় বাঁধা রুপোর ছোট-ছোট ঘণ্টাগুলোর একটাও নেই। ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রাজকন্যা আর একজন অপরিচিত রাজপুত্র।

উদয়নগরের রাজা আশ্চর্য হয়ে রাজকন্যাকে জিজ্ঞাসা করেন–কমলললতা তোমার ঘরের রুপোর ঘণ্টাগুলো কোথায়? আর এই রাজপুত্রই বা কে?

রাজপুত্র সঞ্চয়কুমার এগিয়ে এসে বললেন–মহারাজ রাজকন্যা সেগুলো আমাকে দান করেছেন। আমি-ই সেই সন্ন্যাসী ঠাকুর, আর আমি-ই রাজকন্যাকে বীণা শিখিয়েছি। আমি এখনই ঘণ্টাগুলি আবার জায়গা মতো লাগিয়ে দিচ্ছি।

–আর লাগিয়ে কি হবে? রাজা বিশ্বপ্রতাপ আমার রাজপুরী ঘিরে ফেলেছে কমলললতা, তুমি নিজের দেশের সর্বনাশ করেছ। এই অন্যায় কাজের জন্য তোমাকে প্রাণদন্ড পেতে হবে।

কমলললতা শান্তভাবে বললেন–যথা আজ্ঞা মহারাজ।

রাজপুত্র তখন বললেন–কিন্তু মহারাজ আপনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে যদি আমি রাজকন্যাকে বীণা শেখাতে পারি তবে আপনি আমাকে যা চাইব তাই দেবেন।

–তোমার কথা পরে শুনব রাজপুত্র। দেশের সর্বনাশ যে করেছে তাকে মৃত্যুদন্ড পেতেই হবে। ভীষণ রাগে রাজা উদয়সিংহ এ কথাগুলো বলেন।

সঞ্চয়কুমার তখন এগিয়ে এসে বললেন–তবে মহারাজ একই সঙ্গে আমারও মৃত্যুদন্ড পাওয়া উচিত, কারণ রাজকন্যার সঙ্গে আমিও সমান অপরাধ করেছি।

–বেশ তাই হোক! রাজা উদয়সিংহ তরোয়াল উঁচু করে তোলেন। পিছন থেকে কেউ তাঁর হাত ধরে ফেলেন। রাজা উদয়সিংহ ফিরে দেখেন তাঁর হাত ধরে আছেন বিশ্বপ্রতাপ, রামনগরের রাজা।

–রাজা উদয়সিংহ হাত থেকে তরোয়াল ফেলে দাও ভাই। আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসিনি, এসেছি বন্ধুত্ব করতে। তাছাড়া তোমাদের পিছনে দাঁড়িয়ে আমি সব কথা শুনেছি। কমলললতাকে বীণা শিখিয়েছে সঞ্চয়কুমার। তাকে পুরস্কার দেবার কথা ছিল না তোমার?

–হ্যাঁ ছিল। রাগে দুঃখে তখনও কাঁপছেন রাজা উদয়-সিংহ।

–আর রাগ নয় বন্ধু, আজ আমি আমার ছেলের সেই পুরস্কারটা চাইতে এসেছি।

–সেটা কি?

–তোমার মেয়ে রাজকন্যা কমলললতাকে আমার ছেলের বৌ করে নিয়ে যেতে চাই। এত ভাল মেয়ে কোথায় পাব? তুমি আমার ছেলে সঞ্চয়কুমারকে পুরস্কারটা দিয়ে দাও। আমি আমার ছেলে, বৌ, সৈন্যসামন্ত নিয়ে রামনগরে ফিরে যাব।

উদয়নগরের রাজা এবার সত্যি তরোয়াল ফেলে দিয়ে রামনগরের রাজাকে জড়িয়ে ধরেন।

–সেকি এখনই কোথায় যাবেন? এত তাড়াতাড়ি তো যাওয়া হবে না, কিছুতেই না।

খবর পেয়ে রানী ছুটে এলেন, মন্ত্রী ছুটে এলেন, এলেন সেনাপতি আর রাজ্যের সব লোক।

তারপর মহা ধুমধাম করে রাজকন্যা কমলললতার সঙ্গে রাজপুত্র সঞ্চয়কুমারের বিয়ে হয়ে গেল। সাত দিন সাত রাত দু দেশের লোকের চোখে এক ফোঁটা ঘুম নেই। শুধু আনন্দ আর আনন্দ।

ছবি: ইন্দ্রনীল ঘোষ

অগ্নিযুগের সৈনিক

ছত্তিশগড়ের নারায়ণ সিং

চরণ দাস

সারাংগড়ের আদি গোন্ড পরিবারের অনেকেই এক সময় সেই অঞ্চল ছেড়ে চলে যান ছত্তিশগড়ের রায়পুর জেলার সোনাখানে। সেখানে গিয়ে তারা নিজেদের বিনঝাওয়ার বলে পরিচয় দিতে থাকেন। এমনি এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন নারায়ণ সিং। ওঁর ঠাকুর্দার বাবা ছিলেন, সোনাখান জমিদারের দেওয়ান। সে কারণে তাঁদেরও কিছু ভূসম্পত্তি ছিল।

নারায়ণ সিং-এর বয়স যখন পঁয়ত্রিশ, তিনি তাঁর বাবার কাছে থেকে তাঁদের সম্পত্তি দেখাশোনার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেন। সেই সময় তিনিই ছিলেন ওই অঞ্চলের সব থেকে অল্পবয়স্ক জমিদার।

১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে ইংরাজরা যুদ্ধের নামে ছল-চাতুরি করে পুরো ছত্তিশগড় নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়! যে ভাবে ইংরাজরা ওই অঞ্চলটা দখল করে, তাতে জনসাধারণ প্রচন্ড ক্ষোভে উত্তেজিত হয়ে পড়ে। ছত্তিশগড়ের বহু জমিদারও ইংরাজদের ওভাবে ছত্তিশগড় দখল করা নিয়ে মনে মনে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েন। ওই উত্তেজিত জমিদারদের মধ্যে নারায়ণ সিংও একজন।

ছত্তিশগড় দখল করেই ইংরাজরা স্থানীয় শাসনব্যবস্থায় বাধা সৃষ্টি করতে শুরু করে দেয়। সেখানকার প্রচলিত আইন-কানুন তারা রাতারাতি তাদের সুবিধার জন্য বদল করতে শুরু করে দেয়। এমন করলে স্থানীয় লোকজনদের ভাল হবে না মন্দ হবে, সে সব দেখার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা তাদের ছিল না। তারা এসেছে শাসনের নামে লুঠ করতে। তা করতে হলে যা যা সুযোগ-সুবিধা দরকার সেসব বজায় রাখার জন্যই দেশে নতুন আইন তৈরি হলো।

এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে নারায়ণ সিং ইংরাজদের কাছে প্রতিবাদ পত্র পাঠান!

সেই সময়েই গোটা সোনাখান অঞ্চল জুড়ে খাদ্যশস্যের অভাবে প্রায় দুর্ভিক্ষের মতো অবস্থা হলো! বৃষ্টি হলো না পরপর পাঁচ বছর। ফসল মারা গেল। গোটা অঞ্চল জুড়ে হাহাকার পড়ে গেল।

নারায়ণ সিং সাধারণ মানুষের কাছের মানুষ। সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। জনসাধারণ এলো তাঁর কাছে খাদ্যের আশায়। নারায়ণ সিং তাঁর মজুদ সব শস্য বিলিয়ে দিয়েছিলেন। নিজের বলতে তখন তাঁর কাছে কিছুই ছিল না।

তিনি ঠিক করলেন আশপাশের পরিচিতদের কাছ থেকে তাদের মজুদ শস্যের কিছু অংশ চেয়ে এনে কাজে লাগাবেন। কিন্তু তিনি চেনা অচেনা, আপন পর সবার কাছে চেয়েও এককণা শস্য যোগাড় করতে পারলেন না। সবাই তাঁকে সাহায্য করতে অস্বীকার করল।

সবার বাড়তি মজুদ শস্য আছে অথচ দেশের এমন দুর্দিনে কেউই তার থেকে কিছুই দেবে না! এই ব্যাপারটা নারায়ণ সিং-এর কাছে ভীষণ খারাপ লাগল। মানুষ না খেয়ে মরবে অথচ যাদের সামর্থ্য আছে তারা সাহায্য করবে না। এও কি হতে পারে! তিনি তখন নিজে দাঁড়িয়ে ব্যবসাদারদের বড় বড় গুদাম ভেঙে মজুদ খাদ্যশস্য বার করে এনে চাষীদের বিলিয়ে দিতে লাগলেন। তারা বাঁচলে তবেই না দেশ বাঁচবে।

ব্যবসাদাররা ছুটে গেল রায়পুরের ডেপুটি কমিশনারের কাছে ইনিয়ে বিনিয়ে নারায়ণ সিং-এর বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে। কিন্তু গিয়ে শুনল নারায়ণ সিং নিজেই এসে ডেপুটি কমিশনারকে বলে গেছেন, কি কারণে তিনি বন্ধ গুদামের মজুদ শস্য টেনে বার করেছেন।

ইংরাজ ডেপুটি কমিশনার তো ইংরাজ সরকারেরই ভাল মন্দ দেখবে। কারণ সে জানে, নারায়ণ সিং নয়, ওই ব্যবসাদারগুলোকে সাহায্য করলে, তাদের থেকেই ইংরাজ সরকার নানান সুবিধা ভোগ করতে পারবে এদেশে। ব্যবসাদারদের সঙ্গে আগে থেকেই ইংরাজ অফিসারদের বেশ দহরম মহরম ছিল। ফলে ব্যাপারটা দুপক্ষকে ডেকে মিটিয়ে না দিয়ে ডেপুটি কমিশনার নারায়ণ সিংকে বন্দী করার হুকুম জারি করল।

এমন যে হবে তা নারায়ণ সিং ভাবেননি। তাঁকে বন্দী করে রায়পুরে আনা হলো। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ লুঠতরাজের। বিনা বিচারে তাঁকে প্রায় দশ মাস জেলে বন্দী করে রাখা হলো।

জেলে নারায়ণ সিং কিন্তু বন্দী জীবন কাটাবেন বলে ঢোকেননি। গোপনে ব্যবস্থা করে তিনি জেলের মধ্যে একটা সুড়ঙ্গ কেটে পালালেন। পালিয়ে নিজের গ্রামেই ফিরে গেলেন। সেখানে ইংরাজদের অগোচরে স্থানীয় লোকজনদের নিয়ে এক সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুললেন। সোনাখানেই তাঁদের মূল ঘাটি হলো। তাঁরা প্রস্তুত হতে থাকলেন, ইংরাজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার জন্য।

ইংরাজরাও বসে ছিল না। দেশের সব দিকের সব স্বাধীনতা আন্দোলনই ওরা নির্মমভাবে স্তব্ধ করার চেষ্টা চালাচ্ছিল। তার জন্য বীভৎস নিষ্ঠুর সব উপায় তারা নিচ্ছিল। সোনাখানের কৃষক বাহিনী সম্বন্ধেও তারা তেমন ব্যবস্থাই নেবার আয়োজন করল।

লেফটানেন্ট স্মিথের অধীনে থার্ড রেজিমেন্টের একদল সৈন্যকে এনে মোতায়েন করা হলো সেখানে। লেফটানেন্ট স্মিথের ওপর নির্দেশ ছিল, যেভাবেই হোক, যে উপায়েই হোক নারায়ণ সিংকে বন্দী করতে হবে।

একাজে স্থানীয় জমিদার আর ব্যবসাদাররাও স্মিথকে সব রকম সাহায্য দেবার জন্য তৈরি হলো। তারা তখন ভয় পেতে শুরু করেছে নারায়ণ সিংকে। তিনি নিজে জমিদার হয়ে প্রজাদের পীড়ন করে খাজনা তো আদায় করেনই না, বরং তাদের বিপদে নিজে সামনে দাঁড়িয়ে যেখানে মজুদ খাদ্যশস্য আছে তা তুলে এনে বিলিয়ে দেন। প্রজারা তাঁর কথায় ওঠে বসে। এমন চললে তো ভবিষ্যতে কোনো প্রজাই আর জমিদারদের মানবে না। তারা খেয়ে না খেয়ে খাজনা দেবে না। তারা খাজনা না দিলে, ইংরাজ সরকারকে কি করে সময় মতো খাজনা দিয়ে জমিদাররা তাদের জমিদারি রক্ষা করবে। এত যে মদত দেওয়া হয় ইংরাজগুলোকে, সময় কালে তারা তা মনেই রাখে না। নিয়মিত খাজনার টাকা না পেলেই জমিদারি নিলামে চড়িয়ে অন্যকে জমিদার বানিয়ে বসিয়ে দেয়। এমন যে ইংরাজ সরকার তাদের মদত না করলে কি চলে!

একদিন গোপনে ওই সব বিশ্বাসঘাতক জমিদারদের সাহায্যে স্মিথ তার বাহিনী নিয়ে সোনাখান ঘিরে ফেলল। সেদিন নারায়ণ সিং যে সোনাখানে আছেন, সে খবর স্মিথ বিশ্বাসঘাতকদের কাছ থেকে পেয়েছিল।

ঘেরাও হয়ে নারায়ণ সিং তাঁর দলবল নিয়ে যুদ্ধ শুরু করলেন। গোলাগুলি চলতে থাকল দুপক্ষ থেকেই। ইংরাজদের কাছে অতি আধুনিক সব অস্ত্র। তা ছাড়া তারা দলে অনেক বেশি। তাদের সবাই শিক্ষিত সৈনিক। এদিকে নারায়ণ সিং-এর দলে অল্প কজনেরই হাতে অস্ত্র আছে। বাকি গ্রামবাসীরা তাদের নিজস্ব অস্ত্র নিয়ে তৈরি দেশের জন্য লড়তে। তারা সংখ্যায়ও তত বেশি নয়। বেশির ভাগই নিরীহ গ্রামবাসী, যারা শান্তিতে চাষবাস করে বেঁচে থাকতে চায়। ঘেরাওয়ের মধ্যে গুলি গোলা চললে, এই নিরীহ গ্রামবাসীরাই দলে দলে মারা পড়বে। এ কাজ কি করে নারায়ণ সিং ঘটতে দিতে পারেন। যাদের ভালর জন্য তিনি অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছেন, তারাই যদি বেঘোরে মরে তবে তা কেমন যুদ্ধ! নিরীহ গ্রামবাসীদের কথা ভেবেই নারায়ণ সিং আত্মসমর্পণ করলেন।

আবার তাঁকে বন্দী করে আনা হলো রায়পুরে। এবারে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে যুদ্ধ করা। বিচারের প্রহসনে তাঁকে দোষী প্রমাণ করা হলো।

নিজের দেশের দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার অপরাধে তাঁকে ইংরাজরা অপরাধী করল। এমনই ছিল ইংরাজদের ন্যায় বিচার।

বিচারে তাঁকে প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। সেই মতো ১০ ডিসেম্বর, ১৮৫৭ সালে তাঁকে প্রকাশ্য স্থানে ফাঁসি দেওয়া হলো। এই বীভৎসভাবে শাস্তি দেবার কারণ, যাতে ভবিষ্যতে আদিবাসী সম্প্রদায়ের কেউ আর ভয়ে ইংরাজ অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে।

ছত্তিশগড়ের সাধারণ মানুষরা কিন্তু কখনও এই শাস্তির ব্যাপারটা সহজভাবে নেয়নি। নারায়ণ সিং যা কিছু করেছিলেন গরীব প্রজাদের মুখে অন্ন যোগাতে, তা তো তিনি ডেপুটি কমিশনারকে জানিয়েই ছিলেন। তবে কেন তাঁর প্রতি বিচারের নামে এমন নিষ্ঠুরের মতো ব্যবহার করা হলো!

নারায়ণ সিং নিজের প্রাণ দিয়ে ছত্তিশগড়ের মানুষজনকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। ছত্তিশগড়ের সাধারণ মানুষরা ইংরাজ সরকারের আসল রূপ চিনতে শিখেছিল। ছত্তিশগড় জেগে উঠেছিল ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য।

নতুন ধাঁধা

১। বীর নেতার জন্ম
উল্টে পাল্টে একই পাই
আদি কেটে অম্ল।

–প্রণবকুমার সেন
মালিয়াড়া/পুরাতন হাটতোলা
বাঁকুড়া

২। অদ্ভুত জন্তু
শেষ অক্ষর কেটে ফেলেও
গোটা পাবে কিন্তু।

–সোহিনী ও অর্ক মন্ডল
ভাঁটা/সাউথ গড়িয়া
২৪ পরগনা (দক্ষিণ)

৩ কাটলে বাড়ে না কাটলে নয়
তিন বর্ণের মধ্যে খারাপ সুনিশ্চয়।

–অপরূপা নন্দী
কুমরডি/অদ্রা
পুরুলিয়া

৪ খারাপ ভালো অর্ধেক মন্দ
সবার কাছে বিলোয় গন্ধ।

–বিভাংশু দত্ত
পল্লীশ্রী/আরামবাগ
হুগলী

চৈত্র সংখ্যার নতুন ধাঁধার উত্তরঃ– ১। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ২। খাটিয়া ৩। ওয়াটারম্যান ৪। চাবুক

চৈত্র সংখ্যার শব্দমালার উত্তরঃ–

পাশাপাশি

১। ডাব ৩। চামেলি ৫। বেল ৬। নয়নতারা
৮। মাধবীলতা ১১। বোগেনভেলিয়া ১২। কলা
১৩। জবা ১৬। পদ্ম ১৭। গাঁদা

ওপর-নিচ

১। ডালিয়া ২। রংগন ৩। চালতা ৪। লিচু ৭। তাল
৯। পেয়ারা ১০। গোলাপ ১২। কমলা ১৪। বাতাবি
১৫। বেদানা

পৌষ সংখ্যার নতুন ধাঁধার সফল উত্তরদাতাদের নাম

॥ কলকাতা ॥
অর্চিতা, শুভম, রীণা ও প্রকাশ মুখোপাধ্যায়/রূপচাঁদ মুখার্জী লেন; বাপ্পা, চয়ন, হারা, শিপ্রা ও স্মৃতি দত্ত/নাকতলা; শিবানী, মঞ্জুলা, অজয়, পার্থ, সুলতান ও জয় রায়চৌধুরী/সুইনহো স্ট্রীট;

॥ হাওড়া ॥
অমিতাভ, অরুণাভ, অনামিকা, অনন্যা, ডায়না ও অরিন্দম/সদর বক্সী লেন; জয়ন্ত, মান্দান, ঈশিতা, নমিতা ও পাপ্পু/নরসিংহ দত্ত রোড;

॥ ২৪-পরগনা ॥
বীথি, সাগর, নীলিমা, বিজয়, নান্তু, পুলু ও আকাশ মজুমদার/বৈকুণ্ঠপুর, সোনারপুর; নয়ন, পাপু, বাবন ও মাম্মি/কামডহরি, গড়িয়া;

॥ হুগলী ॥
বাচ্চু, বৈজু, শ্রীলেখা, পাপড়ি ও অঞ্জু/শেওড়াফুলী; নন্দিতা, বিক্কু জিক্কু, স্মৃতিকণা ও মুকুল হালদার/বৈদ্যবাটী রেলগেট;

॥ বীরভূম ॥
কাজল, শোভন, নয়না, তিন্নি ও গায়ত্রী পাল রায়/কীর্ণাহার;

॥ বর্ধমান ॥
সৌমেন, সুব্রত, হাম্মু, চাঁপা ও বীতান কুন্ডু/কালনা রোড, বর্ধমান শহর; আশিস, বাদল, পিংকি, শুভ্রা, বন্দনা ও মৌরাণী বিশ্বাস/বর্ধমান শহর;

মাঘ সংখ্যার নতুন ধাঁধার সফল উত্তরদাতাদের নাম

॥ কলকাতা ॥
সুস্থির, মৈনাক, ছন্দা ও গার্গী মিত্র/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড, বেদিয়াপাড়া; সায়ন বসু রায়চৌধুরী/এ. ই./সল্টলেক; পামেলা শূর/জহর পল্লী, নিমতা; শিপ্রা ব্যানার্জী, পৃথা ও শঙ্খ ব্যানার্জী/সুভাষনগর বাই লেন; গোপাল মন্ডল/কাঁকুলিয়া রোড; অশোক, পীযূষ, মিতা ও অর্ণব মুস্তাফী/ দাঁ লেন; অমিতাভ ও মনোজিৎ দে/পশ্চিম বড়িশা, হাউজিং এস্টেট; গোপাল, বাবু ও মৌমিতা/বিদ্যাসাগর, নাকতলা; অনুপ, বিমল, গোপাল, তরুণ, রামপ্রসাদ ও তাপস/চিত্তরঞ্জন কলোনী, যাদবপুর; তরুণ মন্ডল/রাসবিহারী এভিনিউ, গড়িয়াহাট; কমলিকা সাহা/ক্লার্ক স্ট্রীট; বাপী,

মুন্না/গড়িয়াহাট মার্কেট, ৪নং গেট; সুরূপা মুখার্জী/সন্তোষপুর; সুব্রত, বিষ্ণুপ্রিয়া ও মিলি দত্ত/জহুরা বাজার লেন; সুনন্দন সাহা/তেলিপাড়া লেন; রুমা, সীমা ও রমা মন্ডল/ দমদম রোড; তনু, পাপু, টাবু, লাবু, রাজা, যীশু, গোগল, জয় ও রুমকি/বিজয়গড়; মালবিকা, ছায়ারাণী ও গৌবদা সাহা/বেহালা সেন্ট্রাল গভঃ কোয়ার্টার, পর্ণশ্রী; মৃণাল, কৃণাল, বনু, হনু ও ঝুনি চক্রবর্তী/কোল ইন্ডিয়া কম্পেলেক্স্ বাঘা যতীন; সোপান রায়/বেনিয়াটোলা স্ট্রীট; ঝুম, শ্রেয়সী, বুনান, শুভ্রমালা, বাবাই, অয়ন ও দেবাশিস/বেলগাছিয়া ভিলা; জয়, মুনিয়া, টিটো ও ইন্দ্র/হিন্দুস্থান পার্ক; রতন, রুমা, কল্যাণ, দেবাশিস ও স্বপ্না চক্রবর্তী/বৈষ্ণবঘাটা, পাটুলী; বিশ্বনাথ, স্মৃতিকণা ও চন্দনা/গলফ্ গ্রীন, এম. আই জি (১ আর), ফ্লেস-৪; সৈকত, সবিতা ও মধুছন্দা/নিউ বালিগঞ্জ; রাহুল, শাশ্বত ও ইন্দ্রনীল/কৈলাশ ঘোষ রোড, বড়িশা; অপর্ণা, সুপর্ণা, একপর্ণা ও প্রিয়াঙ্কা ভাদুড়ী/পি. জি এইচ শাহ্ রোড, যাদবপুর রক্তিম, পলাশ ও চন্দন নাগ/তালপুকুর, বাঘা যতীন; কৌশিক, সোনালি, বাবন, সৌমাদীপ্ত, মধুছন্দা, মুনু ও অলোক/টেবিন রোড, বরাহনগর মন্দিরা মজুমদার/যোধপুর পার্ক; সুলেখা দত্ত/সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট;

॥ হাওড়া ॥

মীরা, বিমান, রীতা, সবাসাচী ও শতাব্দী মুখার্জী/গণেশ চ্যাটার্জী লেন, শিবপুর; মৌ, কোয়েল ও কৌস্তুভ/রাজবল্লভ সাহা লেন; বৃজুন, রুমা, বাপ্পু, তুলতুল ও শুভ/হাওড়া-১; অতনু মন্ডল/উলুবেড়িয়া; সোমা, মীনাক্ষী, পৌলমী ও সুশীলা/জয়নারায়ণ বাবু আনন্দ দত্ত লেন, খুরুট; প্রদীপ, অপর্ণা, কাবেরী ও কৃষ্ণা বসু/মধুসূদন বিশ্বাস লেন; অমিতাভ, অরুণাভ, অনামিকা, অননা, ডায়না, আকাশ ও অরিন্দম/সদর বকসী লেন; অনন্ত, বিভা, ঝুম ও ঝন্টু হাজরা/দঃ ঝাঁপদহ ডোমজুড়; দেবশ্রী ও রাধা পাল/বাকসারা; দেবর্ষী, দেবায়ন, কৃষ্টি ও সৌরাশিস/কলাবাগান লেন, সাঁত্রাগাছি; মৌসুমী রাহা/রামরাজাতলা; কেশবলাল ভট্টাচার্য/খাঁটোরা

॥ ২৪-পরগনা ॥

টুম্পা, বুয়া, পুঁটি, রূপক, রুম্পা ও রুম্পা/ভাতুরিয়া, রাজারহাট; সোমা, তনিমা, তন্ময় ও অজয় দত্ত/যোতশিবরামপুর; কুশল, শিউলি, কৌস্তুভ, বাবুন বুচুন/ব্যাঙ্ক পার্ক, ওল্ড কালকাটা রোড, ব্যারাকপুর; তমাল, মৈনাক, বরুণ ও ভাস্কর দাশশর্মা/সিংহীবাগান, মণিরামপুর, ব্যারাকপুর; বৈশালী, পল্লব ও জয়াশিস বণিক/সোদপুর; বিমল ও সঞ্জয়/দঃ রামকৃষ্ণপুর, বিষ্ণুপুর; তাপস ও তরুণকুমার মন্ডল/হায়াৎনগর, শিরাকোল; শাজাহান, আনোয়ারা, টুটুল, ডালিয়া, বৈশালী/দমদম বিমান বন্দর; সুদীপ্ত, রীতা ও দেবাশিস চ্যাটার্জী/পঞ্চাননতলা রোড, ভাটপাড়া; ঋত্বিক, ঋতুপর্ণা ও অনিন্দিতা/পদ্মপুকুর, বারুইপুর; অননা সাধুখাঁ/নাপিতপাড়া রোড, নোনা চন্দনপুকুর, ব্যারাকপুর;

॥ হুগলী ॥

আত্রেয়ী, কবরী ও অমল রায়/পানপাড়া বাই লেন, ভদ্রকালী; সমর, সঙ্কিতা, নমিতা, বুলুন, সোমক ও সৈকত চট্টোপাধ্যায়/ঠাকুরবাটী স্ট্রীট, শ্রীরামপুর; মৌমিতা, লতিকা ও শিশির ধনী/আর. কে. স্ট্রীট, উত্তরপাড়া; ঈশান, সুরঞ্জনা, সুনীতি ও অশোক/মাহেশ; প্রদীপ ও মিনতি দে/ব্রেথওয়েট কোয়ার্টার, এ্যাগাস; শ্যামাপ্রসাদ ও সুপর্ণকান্তি দাশ/কয়াপাট, বদনগঞ্জ; স্বাতী বানার্জী/জমিদার রোড, শেওড়াফুলী; শুভাশিস ভট্টাচার্য/তেলিনীপাড়া, ভদ্রেশ্বর; সোমালি ও সুজয় ভট্টাচার্য/ধ্রুবেশ চ্যাটার্জী লেন, উত্তরপাড়া;

॥ মেদিনীপুর ॥

স্বাতী, বোধিসত্ত্ব ও সোনামণি/কালিকাখালি, মঠ চন্ডীপুর; সন্তোষ, তন্দ্রা, সুদীপ ও বিশ্বদীপ/তমলুক; শৌভনিক ও মৌমিতা মজুমদার/তমলুক; কালীপদ, গায়ত্রী, শ্রেয়সী, শান্তনু ও শ্রাবণী/কোশিয়াড়ী; সোমা, মাথী, সুনন্দা ও দেবযানী রায়/গড়বেতা; পাপু, পপি, বুন্টি ও শিবানী সামন্ত/কাখুরিয়া; ছাত্রছাত্রীবৃন্দ/দেউড়িবাড় কিরণপ্রভা বিদ্যামন্দির; শ্রাবণী, নীলরুদ্র ও অনিরুদ্ধ/পাটনাবাজার; প্রণব, নন্দিতা ও অনুমিতা দাশ/কে. টি. সি. পি, মেদিনীপুর; অমিতা, শুভজিৎ ও সৌমাজিৎ/সংলামাড়ো; সোমা ও প্রীতম সামন্ত/কাখুরিয়া বাড়ি; কুহেলি, মহাশ্বেতা ও স্বর্ণোজ্জ্বল চন্দ/খাজড়া;

॥ বর্ধমান ॥

সুমেধা, দেবশ্রুতি, ঋতুপর্ণ ও সুশ্বেতা/বার্ণপুর; রশ্মি ও অভিষেক আচার্য/রাধানগর রোড, বার্ণপুর; কবিতা, তৃহিনা, পূজা, ভোমরা ও শ্রুতকর্ণ/এ. বি. এল. টাউনশীপ, দুর্গাপুর; অনুজিৎ, তনুশ্রী, প্রণতি, অমিতাভ, প্রিয়াঙ্কা, রেশমা ও শুভাশিস/কোক ওভেন কলোনী, দুর্গাপুর; পার্থ ও সুকান্ত মুখোপাধ্যায়/বল্লভপুর, রানীগঞ্জ; প্রদীপ, সুদীপ, শিখা ও দীপা/রাসডাঙা, আসানসোল; অর্ণব সিংহ ও সুলাল গোস্বামী/অন্ডাল সাউথ বাজার; সংহিতা ও অপ্রতিম/নিউ আপার চেলিডাঙা, আসানসোল; অভিকচিত্ত, নবনীতা ও শুভেন্দুবিকাশ/মহিশীলা, আসানসোল; মৌমিতা ও দেবলীনা নাগ/বস্তীনবাজার, আসানসোল; মঞ্জু, শমিতা, নীলোৎপল ও জয়শ্রী/শাঁখারিপুকুর; শিল্পী ও সাথী/বেলিডাঙা, আসানসোল; শতভিষা, যশোধারা, বাসবী ও ডাঃ উত্তমকুমার বটব্যাল/পাটমোহনা কোলিয়ারী;

॥ বাঁকুড়া ॥

দেবাশিস রায়/প্রতাপ বাগান (পূর্ব); মিলটন, কল্লোল, মৌসুমী, অষ্টমী, পার্থ, বৈশাখী ও টুসি/মনোহর; কার্তিক, কুসুম/ব্যাপারিহাট; জীতেন্দ্রনাথ দত্ত/মেজিয়া; গোপা, কর্ণা, সোমেন, শুভ্রাংশু ও শংকর সেন/মালিয়াড়া; মিতালি, আলপনা, প্রতিমা, আভা ও রত্না/মালিয়াড়া; শান্তনু, শর্মিষ্ঠা, নীলাঞ্জন ও বাজু/লোকপুর; পাপাই, স্মিতা, মিনতি ও অনীতা মুখোপাধ্যায়/অর্ধগ্রাম;

॥ নদীয়া ॥

সুশান্তকুমার বিশ্বাস/কল্যাণনগর, মদনপুর; অমিত, অসিত ও সুমিত/মাজাদিয়া রেল কোয়ার্টার্স; সুদীপ্ত কাষ্ঠ/বুড়োশিবতলা লেন, শান্তিপুর; অর্পিতা ও পিকু/কৃষ্ণনগর· অনিরুদ্ধ, মৌ ও তুলি দত্ত/মহীতোষ বিশ্বাস স্ট্রীট, কৃষ্ণনগর; গোপাল বসু/আসাননগর; ছুটি, মিঠু ও চন্দন মন্ডল/পলাশীপাড়া; মলয় মুর্মু/সার্কিট হাউস, কৃষ্ণনগর;

॥ মুর্শিদাবাদ ॥

সঞ্জয় কর্মকার/বেলডাঙা, চ্যাটার্জীপাড়া; শ্রাবণী সাহা/বহরমপুর; পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়/পিলখানা রোড, বহরমপুর; মন্দিরা ও মধুরিমা মিত্র/মধুপুর, বহরমপুর; অমিত, আশিস, রীণা ও তপু/ফারাক্কা ব্যারেজ; শঙ্খদ্বীপ নিয়োগী/পিলখানা রোড, বহরমপুর; কাজল ও কমল/ইন্দ্রপুরী, খাগড়া;

॥ বিহার ॥

পুতুল, সুদাম, স্বপন, মালা, রীণা, সুশান্ত ও টুকু/জামশেদপুর, সাকচী; চন্দন ও শ্রাবণী দত্ত/সোনারি, জামসেদপুর; অনির্বাণ ও দেবানিকা/শ্যামলী কলোনী, রাঁচী; সৌরেন ও শৌভিক ঘোষ রায়, মিলি দত্ত ও সুমিত মিত্র/মৌভান্ডার, ঘাটশীলা; বুবুন, টুবুন, মলিনা ও খাঁদু/টেলকো কলোনী, জামশেদপুর; দেবশ্রী ও দেবস্মিতা বসাক/বিনোদপুর, কাটিহার; প্রিয়নাথ ও শুভ্রা মাজি/কার্মিকনগর কলোনী, ধানবাদ;

নতুন শব্দমালা

বিষয়–ভারতের স্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনার সময়কাল।

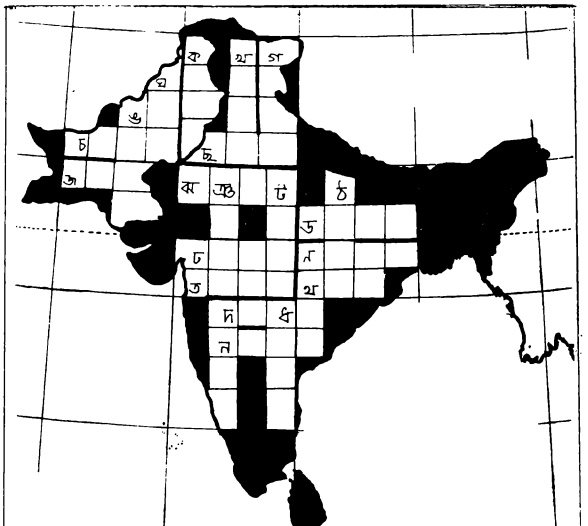

তৈরি করেছেন

শিশির সাহা, বাসুদেবপুর, আরামবাগ, হুগলী–৭১২৬০১

সূত্র

পাশাপাশি

চ) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পত্তন
ছ) আরবদের ভারত আক্রমণ (মহম্মদ বিন কাসেম)
জ) শংকরাচার্যের দেহাবসান
ঝ) পৃথ্বীরাজের সংগে মহম্মদ ঘোরীর তরাইনের প্রথম যুদ্ধ
ড) মাদার টেরেসার নোবেল পুরস্কার লাভ
ঢ) কুতুবমিনার নির্মাণ
ণ) রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ
ত) আওরংগজেবের সিংহাসন লাভ
থ) গোপালের পাল বংশের প্রতিষ্ঠা
দ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে বছর নোবেল পান
ন) তৈমুরের দিল্লী লুণ্ঠন

ওপর-নিচ

ক) গুরু নানকের জন্ম
খ) দীনেশ গুপ্তর ফাঁসি হয় যে বছরে
গ) ভারত ছাড়ো আন্দোলন
ঘ) কণিষ্কের সিংহাসন লাভ

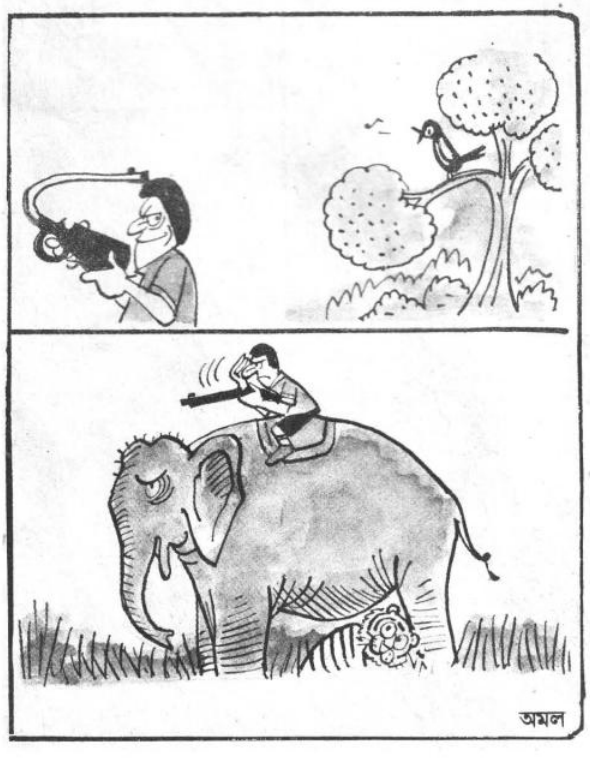

ঙ) সুলতান মামুদের পাঞ্জাবরাজ জয়পালের রাজ্য আক্রমণ
ঞ) পানিপথের প্রথম যুদ্ধ
ট) লালা লাজপত রায়ের মৃত্যু
ঠ) রাজীবের প্রধান মন্ত্রীত্বের শপথ পাঠ
ণ) নাদির শাহ-র ময়ূর সিংহাসন লুঠ
দ) তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ চৌহানের পরাজয়
ধ) মাস্টারদা সূর্য সেনের চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন

জানো কী

■ কৃষ্ণপক্ষের রাত। অন্ধকার তো একটু বেশি হবেই। পরেশের মনে হয় অন্ধকারটা যেন জমাট বেঁধে তাকে গিলতে আসছে। অস্বস্তিতে, ভয়ে কেঁপে ওঠে পরেশ। কিন্তু কেন? কি হবে এবার?

■ রামানুজ দেবনাথ ফার্স্ট হয়েছে। ছুটে এলেন আত্মীয়-স্বজন। এলেন খবরের কাগজের রিপোর্টাররা। তাঁরা রামানুজকে জিজ্ঞেস করলেন, কি পড়বে ঠিক করেছো? রামানুজ অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে উত্তর দিলো, আমার আশ্রমে ফিরে যাবো। রামানুজের আশ্রম–সে আবার কি? কোথায়? ব্যাপারটা কি?

■ আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছিলো এক ঝাঁক হাঁস। ঝোপের আড়ালে দড়িতে বাঁধা একটি হাঁস গলা দিয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ বের করলো। অমনি হাঁসের ঝাঁক নিচে নামতে শুরু করলো। দড়িতে বাঁধা হাঁসটা উড়তে না পেরে গলা দিয়ে তীক্ষ্ণ একটা আওয়াজ করলো। অমনি মাটির দিকে নেমে আসা হাঁসের দল মুহূর্তের মধ্যে ওপরে উঠে উড়ে গেলো। তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলে কি জানিয়েছিলো দড়িতে বাঁধা হাঁসটা?

■ রাতের প্রহরীরা পথ আগলে দাঁড়ালো। কি তার পরিচয়, কোথা থেকে আসছে–এসব না জানালে তারা কিছুতেই আগন্তুককে যেতে দেবে না। কিন্তু নষ্ট করার মতো অতো সময় নেই আগন্তুকের। দেরি হলে যে ভীষণ ক্ষতি হয়ে যাবে। কি ক্ষতি হবে? আগন্তুকের অতো তাড়াই বা কিসের?

■ বিলি সাসপেন্ড হচ্ছে। রেফারি তাঁর রিপোর্টে বিলির বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছেন। কি হবে বিলির? ও কি আর খেলতে পারবে না?

এই সব প্রশ্নের উত্তর পাবে শুকতারার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়। সেই সংগে আরো অনেক কিছু যা তোমাদের চমকে দেবেই।

অনুবাদ সিরিজ

বিশ্ব সাহিত্যের মণি মুক্তার সংগ্রহশালায় দেব সাহিত্য কুটীরের নতুন সংযোজন

জ্যাক লন্ডন-এর
হোয়াইট ফ্যাং
কল অব দ্য ওয়াইল্ড

রিচার্ড হেনরি ডানা-র
টু ইয়ার্স বিফোর দি মাস্ট

হেনরি হল কেইন-এর
দ্য বন্ড ম্যান

জোয়ান রুডলফ ওয়াইজ-এর
সুইস ফ্যামিলি রবিনসন

চার্লস কিংসলি-র
হাইপেশিয়া

এইচ, জি, ওয়েল্‌স্‌-এর
দ্য ফার্স্ট মেন ইন দ্য মুন
দ্য ওয়ার অব দ্য ওয়ার্লড্‌স্‌
ইনভিজিবল ম্যান
দ্য স্লীপার অ্যাওয়েক্‌স্‌

মার্ক টোয়েনের
অ্যাডভেঞ্চারস্‌ অব টম সইয়ার
দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব হাকলেবেরি ফিন্‌
এ কনেক্টিকাট ইয়াংকি ইন কিং আর্থাস কোর্ট
দ্য প্রিন্স অ্যান্ড দি পপার
পাডনহেড উইলসন

ভিক্টর হ্যুগোর
লা মিজারেবল
টয়লার্স অব দ্য সী
হাঞ্চব্যাক অফ নৎরদাম
দ্য ম্যান হু লাফ্‌স্‌

এরিক মারিয়া রেমার্ক
দি ব্ল্যাক অবলিস্ক
অল কোয়ায়েট অন্য দ্য ওয়েস্টার্ণ ফ্রন্ট

এডগার ওয়ালেসের
ট্রেইটরর্স গেট

র‍্যাফেল সাবাটিনির
অ্যাক্রস দ্য পিরেনিজ
দি লস্ট কিং

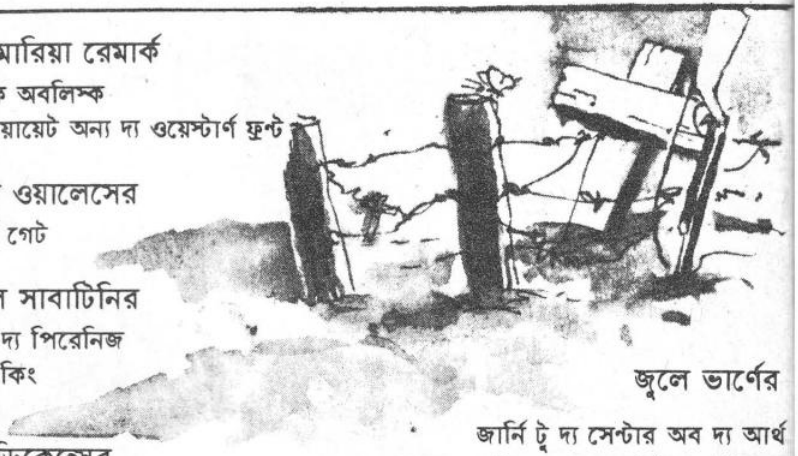

চার্লস ডিকেন্সের
নিকোলাস নিকোলবি
এ টেল অব টু সিটিজ
গ্রেট এক্সপেক্টেশনস
ডেভিড কপারফিল্ড
অলিভার টুইস্ট

হেনরি রাইডার হাপার্ড-এর
দি মুন অব ইজরায়েল
কিং সলোমন্‌স্‌ মাইন্‌স্‌

রবার্ট লুই স্টিভেনসনের
কিডন্যাপ্‌ড
ব্ল্যাক অ্যারো
ট্রেজার আইল্যান্ড
ডঃ জেকিল অ্যান্ড মিঃ হাইড
দ্য বটল ইম্প

জুলে ভার্ণের
জার্নি টু দ্য সেন্টার অব দ্য আর্থ
রাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইন এইট্টি ডেজ
লাইটহাউস

ওয়াল্টার স্কট-এর
রব রয়
আইভ্যান হো
ট্যালিসম্যান
দ্য ফেয়ার মেইড অব পার্থ

জেমস কুপারের
দ্য লাস্ট অব দি মহিক্যান্‌স্‌
দ্য পাথ ফাইন্ডার

জর্জ এলিয়টের
মিড্‌ল মার্চ
সাইলাস মার্নার

আলেকজান্ডার দুমার
থ্রি মাসকেটিয়ার্স
দি ম্যান ইন দি আয়রণ মাস্ক
দি কন্সপিরেটর্স
কাউন্ট অব মন্টিক্রিস্টো
ব্ল্যাক টিউলিপ
কাউন্টেস দ্য চার্নি

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ, ২১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

হাওয়া-চরকি

কুমারেশ ঘোষ

দাদু সেদিন দুষ্টুদের ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় শুনলেন, দুষ্টু খুব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়চে।

দাদু একটু থেমে শুনলেন, ইতিহাস পড়চে।

কিন্তু অত মন দিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়বার কারণটা কি? এই তো সেদিন পরীক্ষা হয়ে গেল। কত ঘটা করে প্রণাম করে গেল পরীক্ষা দিতে।

বেশ খানিক পরে দুষ্টু দাদুর ঘরে আসতেই দাদু জিগ্যেস করলেন, অত মনোযোগ দিয়ে পড়ছিলে, কি ব্যাপার?

দুষ্টু বললো, ব্যাপার আবার কি? তোমরাই তো বলো মন দিয়ে পড়ো, মন দিয়ে পড়ো, তাই পড়ছিলাম। বাবা, এতেও দোষ!

দাদু হেসে বললেন, দোষ নয়। তবে তোমার মন দিয়ে পড়া দেখে আমার মনে খুব ভয় হচ্ছিলো।

–ভয়?

–হ্যাঁ, ভয়। জানো, মন দিয়ে পড়লে কাক এসে মাথায় 'অ্যা' করে দেয়। –দাদু হাসলেন।

–সে আবার কি?–দুষ্টু অবাক। তুমি কি যে বলো দাদু বুঝিনে। লোকে তো বলে, লেখাপড়া করে যে গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে। তুমিও বলেচো। আর এখন বলচো, মন দিয়ে পড়াশুনো করলে মাথায় কাক এসে 'অ্যা' করে দেয়। আশ্চর্য!

আরো বললো দুষ্টু, যাক, ভালোই হলো। আর মন দিয়ে পড়তে হবে না। মাকে বলে দিও পড়তে গিয়ে অন্যমনস্ক হলে মা যেন না বকে।

দাদু বললেন, আচ্ছা, আচ্ছা, বলে দেবো।

দুষ্টু কিন্তু ছাড়লো না দাদুকে। বললো, কিন্তু বলো তো দাদু, তুমি ও কথাটা বললে কেন?

–কারণ আছে, কারণ আছে। আমি এমনি এমনি বলিনি কথাটা।–দাদু খুব গম্ভীরভাবে কথাটা বললেন।

–না, তোমাকে বলতেই হবে।

দাদুর গলা জড়িয়ে ধরলো দুষ্টু।

দুষ্টু জানে, দাদুর গলা একবার জড়িয়ে ধরতে পারলে, গলা দিয়ে কথা ঠিক বেরুবেই।

এবার কিন্তু দাদুর গলায় কোনো কথাই বেরুলো না। শুধু বললেন, ঠিক আছে, তোমাকে দেখাবো।

দুষ্টু ধরে বসলো, তবে চলো, আজই চলো।

–আজ না। অন্যদিন। আজ আমার কোমরে ব্যথা।

কিন্তু ফস্ করে একটা কথা বলে দিলেই হলো নাকি!

তাছাড়া এমন একটা কথা, যা সত্যি হলে আর মন দিয়ে বা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়তে হবে না। কিংবা একদম পড়তেই হবে না।

কাজেই পরদিন দুষ্টু আবার চেপে ধরলো দাদুকে। দাদুকে

একটা কাগজের হাওয়া-ফুল দেখিয়ে বললো, দ্যাখো দাদু, আমি বাজে কাগজ আর সরু তার দিয়ে কী সুন্দর হাওয়া-চরকি তৈরি করেচি! জোরে হাওয়া লাগলেই বনবন করে ঘুরবে। দাঁড়াও। পাখা চালিয়ে দিতেই কাঠির মাথায় ফর্‌ফর্ করে উড়তে লাগলো হাওয়া-চরকি।

–এই –এই, বন্ধ কর ফ্যান। আমার সব কাগজপত্তর উড়ে গেল। দাদু আঁতকে উঠলেন।

দাদুর টেবিলের সব কাগজপত্র ততক্ষণে ঘরের মেঝেয় ছড়াছড়ি। দাদু নিচু হয়ে তুলতে লাগলেন। অবশ্য দুষ্টুও।

দাদু কাগজগুলো একটা পেপার-ওয়েটে চাপা দিয়ে বললেন, আচ্ছা আচ্ছা, তোমাকে ময়দানে নিয়ে যাবো। সেখানে তোমার হাওয়া-ফুল নিয়ে দৌড়িও। দেখো কেমন ঘুরবে ওটা।

তাই হলো।

বিকেলের দিকে দাদু দুষ্টুকে নিয়ে একটা মিনিবাসে চৌরঙ্গীতে গেলেন। সেখান থেকে হেঁটে ময়দানের দিকে।

যেতে যেতে কয়েকটা স্ট্যাচু দেখে দুষ্টু দাদুকে জিজ্ঞেস করলো, কার মূর্তি দাদু?

দাদু পরিচয় করিয়ে দিলেন, স্যার আশুতোষ, সুরেন বাঁড়ুজ্জে, নেতাজী প্রভৃতি।

আরো বললেন, আরো অনেক স্ট্যাচু আছে।

দেখে দুষ্টু হঠাৎ বললো, ওঁদের মূর্তির মাথা দিয়ে চুন গড়াচ্ছে কেন?

–চুন নয়।–দাদু হাসলেন, ওসবই হচ্ছে কাকের 'অ্যা'।

এবং একটা স্ট্যাচুর উপর সত্যিই দেখা গেল একটা কাক বসে আছে।

দাদু আবার হেসে বললেন, এঁরা সব মন দিয়ে খুব পড়াশুনো করেছিলেন। তাই বিখ্যাত হওয়ায় এঁদের স্ট্যাচু তৈরি করা হয়েচে। কিন্তু যত্নের অভাবে, দেখো, কি অবস্থা হয়েচে। তাই বলছিলাম–

দুষ্টু হেসে বললো, এতক্ষণে বুঝলাম। তা তুমি এসব বাবা আর মাকেও দেখিও। বুঝলে?

বলেই খোলা ময়দানে হাওয়া-চরকি নিয়ে দৌড়োতে লাগলো দুষ্টু। আর ফর্‌ফর্ করে ঘুরতে লাগলো চরকিটা।

হাওয়া-চরকি তৈরি করে এমন ছুটলে কাক নিশ্চয়ই মাথায় 'অ্যা' করতে পারবে না।

ছবি: সুফি

হাঁদা-ভোঁদার
কোটের চোট
আমি একটা লম্বা কোট আর একটা পরচুল যোগাড় করেছি। টাউনহলে বড়দের মিটিংএর শেষে ইটিং হাতাতে এগুলি সাহায্য করবে, ভোঁদা।
টাউন হল
আলোচনা সভা
শেষে জলযোগের ব্যবস্থা
দ্যাখ, ভোঁদা! কেউ বুঝতে পারেনি!
পরে
অ্যাই! দু'জোড়া হাত!
ঠকাস!
জলদি কেটে পড়, ভোঁদা-
আউফস!
ঘুরে রাস্তার বাঁকে এসে
উফ্! এটা ঠিক হচ্ছে না। সব দৌড় ঝাঁপ আমাকেই করতে হচ্ছে!
বাহ্: কিন্তু কোঁৎকার ঘাগুলো যে আমার মাথায় পড়েছে রে, হোঁৎকা!
কিছু পরে
অ্যাই! থাম, সেদিন তুই আমার হাত ফস্কে পালিয়েছিলি। আজ তোকে তুলোধোনা করবো!
মরেচে! এযে, খেঁটে মস্তান।
জলদি কোটের ওদিকটা ধর!

এসো, খোঁদ্দা! আমাকে ধোলাই লাগাতে এই কোটের ওপর লাফিয়ে নামতে পারো, আমরা ধরে আছি!
খুবই ভালো কথা।

ওরে গেছি রে!
আমরা কোটটা একটা বড় পাথরের ওপর রেখেছিলাম, তুমি তার ওপরেই লাফ মেরেছো!

সবচেয়ে ভালো এবার কোটটা ঘরে রেখে আসবি, ভোঁদা!
কোটটা কার?
পিসেমশাইয়ের।

আপনার লম্বা কোট, পিসেমশাই! হাঁদা নিয়েছিলো, আমাকে বললো আপনার ঘরে রেখে আসতে।
অ্যাই মরেচে! কোট যে কখন ফুটো হয়ে গেছে!

ইর্‌ক্! আমার সাধের কোটের একি হাল!

গর্‌র্! হতভাগা, মর্কট! আজ তোর ছাল ছাড়িয়ে আমার কোটের তাপ্পি লাগাবো!
ছাল ছাড়ালে তোকে কেমন দেখাবে তাই দেখতে দাঁড়িয়ে আছি, হাঁদা।

আলোয় ফেরা

অলক দত্তচৌধুরী

অনিমেষ চন্দ্র স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কৃত গল্প

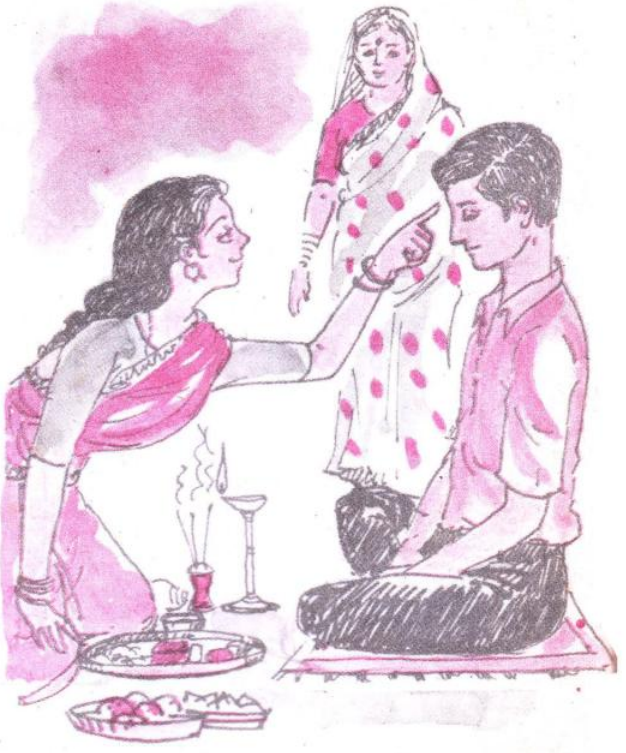

সবাইকে তুই যেতে বললি, আমি যাব না?–মকবুলের কথা শুনে দাঁড়িয়ে গেল পাপিয়া। খানিকক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কিছু ভাবল, তারপর বলল, আচ্ছা, তুইও কাল আসিস।

কালীপুজোর ভাসান শেষ করে একটু রাত করেই বাড়ি ফেরে মকবুল। পাপিয়া মেয়ে হলেও ওদের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে খেলাধূলা করে, মারপিঠ করে, গান গায়, এমন কি সময় সময় আড্ডা দিতেও কুণ্ঠা বোধ করে না। পাপিয়ার মা-বাবাও আগেকার দিনের মতো কুসংস্কারাচ্ছন্ন নন, বরং অনেক বেশি স্বাভাবিক। তাই মেয়েকে কোনো ব্যাপারে খুব একটা বাধা দেন না। তার মানে এই নয় যে যা খুশি তাই করবে।

পাপিয়ার মতো মেয়েকে বন্ধু হিসেবে পেয়ে মকবুল খুব গর্বিত। ভাইফোঁটা সম্বন্ধে মকবুল অনেক কিছু শুনেছে। কিন্তু ভাইফোঁটার মজাটা যে কোথায় লুকিয়ে আছে সে সম্বন্ধে তার কোনো ধ্যানধারণা নেই। এই বারো তেরো বছর বয়সে ভাইফোঁটার মজাটা জানবার ইচ্ছাও তার ছিল না। কিন্তু হঠাৎ কি হলো আজ পাপিয়াকে সরাসরি বলে ফেললো। বোন নাকি ভাইয়ের কপালে চন্দন-দই আর কি সব দিয়ে ফোঁটাটোটা দেয় আর ভালমন্দ খাওয়া-দাওয়া করে। এর বেশি কিছু জানা নেই মকবুলের। কিন্তু কাল যদি পাপিয়া তাকে ভাইফোঁটা না দেয়, কিংবা তার বাবা-মা যদি তাকে দিতে না দেয় তাহলে সে কি করবে? পাপিয়া বললেও কি তার যাওয়া উচিত? যদি অন্য বন্ধুরা হাসাহাসি করে? আচ্ছা, কি দোষ তার? ভিন্ন জাত বলে, মুসলমান বলে–এইসব চিন্তা করতে করতে রাত কাটিয়ে দেয় মকবুল।

সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে আব্বাজান ও আম্মাকে ডেকে বলে, আমি না আজ পাপিয়ার কাছে ভাইফোঁটা নিতে যাব, পাপিয়া আমাকে যেতে বলেছে। মকবুলের মা-বাবা মকবুলের মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু একটা কথাই বললেন, তোকে ভাইফোঁটা দেবে তো? দূর থেকে বোন আয়েষা ভাইজানের চোখে চোখ রেখে একটু মুচকি হেসে পালিয়ে যায়।

মকবুল তাড়াতাড়ি গোসল করে পুজোর নতুন জামাপ্যান্ট পরে পাপিয়ার বাড়িতে চলে আসে। ওর আসার আগেই পটলা, ঘোতনা, শিশির, তাতাই এসে হাজির হয়েছে। পাপিয়ার বাবা মকবুলকে ডেকে নিয়ে ঘরে বসান। পাপিয়াকে ডেকে বলেন, মামণি, এবার তোমার কাজ শুরু করে দাও। কথাগুলো বলে একটা সিগারেট ধরিয়ে সোফায় হেলান দিয়ে বসেন।

সুন্দর একটা দামী লাল রঙের শাড়ি পরে, চানটান করে পরিষ্কার হয়ে পাপিয়া ওদের কাছে এসে দাঁড়ায়। আজকের পাপিয়াকে অন্যদিনের পাপিয়া থেকে অনেক আলাদা মনে হয়, অনেক বড় মনে হয়। ভয় হয় মকবুলের। ওদের সবার দিকে একবার তাকিয়ে আবার ভেতরের ঘরে চলে যায় পাপিয়া। নিজেরা নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি করলেও কেউ কোনো কথা বলে না। মাথার ওপর ফ্যান ঘুরতে থাকে।

পাপিয়ার মা একটা রেকাবিতে বসানো চন্দনের বাটি আর একটা জ্বলন্ত প্রদীপ ঘরের এক ধারে মেঝের ওপর রেখে চলে যান। ফিরে আসেন একটা আসন ও শাঁখ হাতে। আসনটি তিনি প্রদীপের কাছে পেতে দেন। পাপিয়াও ইতিমধ্যে থালা ভর্তি খাবার নিয়ে এসেছে। এরপর পাপিয়া ওদের এক এক জনকে ডেকে আসনে বসিয়ে কপালে দই-চন্দনের ফোঁটা দিয়ে কি সব বলতে থাকে। যাকে ফোঁটা দেয় সে হাসতে হাসতে খাবারের থালা নিয়ে ফিরে আসে। মকবুল লক্ষ্য করে যে প্রত্যেকবার ফোঁটা দেওয়ার সময় পাপিয়ার মা শাঁখ বাজান। বাবাও হাসতে থাকেন। এক সময় মকবুলও প্রদীপের কাছে গিয়ে বসে। শাঁখে ফুঁ পড়ে। পাপিয়া তার বাঁ হাতের কড়ে আঙুলে দই-চন্দন তুলে নিয়ে মকবুলের কপালে ঠেকায়। মকবুলের শরীরে কাঁটা দেয়। এতকাল পাপিয়ার হাতের চড়-

থাপড় অনেক খেলেও আজকের কড়ে আঙুলের ছোঁয়া তার অনেক ভারী মনে হয়। দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। আয়েষার মুচকি হাসিটা আর একবার উঁকি দিয়ে চলে যায়।

ছবি ঃ রাহুল মজুমদার

ভাইফোঁটার মজা

শঙ্কর চক্রবর্তী

অনিমেষ চন্দ্র স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় পুরস্কৃত গল্প

দাদা অমল, বাবা এবং মা এই নিয়েই মৌমিতাদের সংসার। বাবা এখনও চাকুরি করছেন, অমল কয়েক বছর হলো চাকরি পেয়েছে, থাকে অসমে। মৌমিতার যত আবদার সবকিছুই দাদার কাছে। অমলও মৌমিতাকে খুব ভালবাসে। ছোট বোনের কোনো আবদারই সে ফেলে রাখে না। যখন চাকরি করত না,টিউশনি করে সামান্য যা কিছু পেত তা থেকেও মৌমিতাকে হাতখরচ হিসাবে দিত। এবার যখন ক্লাশ এইট থেকে পাশ করে নাইনে উঠল মৌমিতা, অসম থেকে টাকা পাঠিয়েছিল ঘড়ি কেনার জন্য। অমল ছুটি পায় খুব কম, তাই কলকাতায় আসা হয় না। তবে দুর্গাপুজোর সময় আসে আর ভাইফোঁটার পর দিন ফিরে যায়। ঐ কটা দিন মৌমিতার হইচই করে কেটে যায়।

এবার মৌমিতা ভাইফোঁটার সময় অমলকে নিজের হাতে বোনা একটা সোয়েটার দেবে ঠিক করেছে। এইটাই হবে তার ভাইফোঁটার উপহার। সময় পেলেই সে বুনতে বসে যায়। পুজোর আগে বোনা শেষ করতে হবেই। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে রুটিন করে বোনার কাজটাও তাই চালিয়ে যায় সে। কেন না পুজোর আর বেশি দেরি নেই।

পুজার কেনাকাটি শুরু হয়েছে, এমন সময় দাদা অমলের একটি চিঠি এল অসম থেকে। মৌমিতা ইস্কুল থেকে ফিরে এসেই জানতে পারল এবার পুজোয় দাদা আসতে পারছে না। খবর শুনে মৌমিতার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। দাদার ওপর ওর খুব রাগ হলো। কী এমন কাজ যে পুজোতেও ওখানে থাকতে হবে! তাহলে এবার দাদাকে সে ফোঁটা দিতে পারবে না। অভিমানে মৌমিতার চোখে জল এল।

কোনো কাজেই আর তার মন নেই। লেখাপড়াও করতে ইচ্ছা করছে না। এক সময় মা জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁরে, মৌমি কি ব্যাপার বলতো? কদিন ধরেই তোকে কি রকম মনে হচ্ছে। শরীর খারাপ হয়নি তো!'

মৌমিতা কোনোরকমে জবাব দিল, 'না মা, শরীর ঠিকই

আছে।'

মৌমিতার মা বুঝতে পারলেন আসল অসুখ কোথায়। তিনি বললেন, 'অমল আসবে না বলে মন খারাপ, বুঝতে পারছি। কিন্তু কী করবি বল অফিস কাছারি ছেড়ে তো আর আসা যায় না।'

দেখতে দেখতে পুজো এসে গেল। পুজোর চারটি দিন মৌমিতা ঘরের বার হয়নি। বন্ধুরা এসেছিল, তাদের সংগেও সে কোথাও যায়নি। সারাটা দিন বাড়িতে বসে ছিল।

অবশেষে এল কালীপুজো। গত বছর দাদা কত বাজি কিনে এনেছিল। দুজনে তারা সেই বাজি ফাটিয়েছে। এবার সেই সব ঘটনা আরও বেশি করে মনে পড়ছে। মার কথা মতো মোমবাতি দিয়ে সারা বাড়ি সাজাল সে। করতে হয় তাই করা, মৌমিতার মনে কোনো ইচ্ছা নেই।

ভাইফোঁটার দিন মৌমিতা সকাল থেকে বিছানায় শুয়ে আছে। সে ঠিক করে ফেলেছে আজ আর বিছানা ছেড়ে উঠবে না, কিছু খাবেও না। বাবা বাজার থেকে ফিরেছেন কিছুক্ষণ আগে। মা সব জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখছেন। এরই মধ্যে মা এক কাপ চা এনে বাবাকে দিয়ে আবার তাঁর কাজে হাত দিলেন। মৌমিতা শুয়ে শুয়ে সবই দেখছে। আশপাশের বাড়ি থেকে শাঁখের আওয়াজ আর উলুধ্বনি শোনা যাচ্ছে। এমন সময় দরজার কড়া নড়ে উঠল।

মা বললেন, 'মৌমি, দেখ তো কে।' অনিচ্ছা সত্ত্বেও মৌমিতা দরজা খুলতে এগিয়ে যায়। দরজা খুলেই কিন্তু মৌমিতা অবাক হয়ে যায়। দেখে দাদা হাসি মুখে দাঁড়িয়ে। কি বলবে দাদাকে, ভেবে পায় না। রাগে, দুঃখে, অভিমানে চোখে জল এসে যায়। অমল বুঝতে পাবে সব কিছুই, সে মৌমিতাকে দু-হাত দিয়ে বুকে টেনে নেয়। মৌমিতার মুখে হাসি ফোটে।

এরপর সাজসাজ রব পড়ে যায় ফোঁটার জন্য সব যোগাড় করতে। পরে অবশ্য অমল বলেছিল, অফিসের কাজ তো ছিলই তাছাড়া মৌমিতার সংগে একটু মজা করার ইচ্ছাও তার ছিল। তা না হলে এক দিন আগেই সে আসতে পারতো।

ছবি: সুফি

এদের লেখাও ভাল:-তিথি ভট্টাচার্য, নিশ্চিন্তপুর, রামপুরহাট॥ তিমিরবরণ চঁদ, গুসকরা॥ মদনগোপাল বসাক, নবদ্বীপ॥ বিশ্বনাথ মিত্র, চিত্তরঞ্জন॥ কবিতা চৌধুরী, দুর্গাপুর, বর্ধমান॥ কৌশিক পালচৌধুরী, ভদ্রকালী, হুগলী॥ অনিরুদ্ধ দত্ত, কৃষ্ণনগর, নদীয়া॥ অভিজিৎ বেরা, কাঁথি, মেদিনীপুর॥ উমা চন্দ্র, নিশ্চিন্তপুর পাড়া, বীরভূম॥ সুব্রত পন্ডিত, গোপালগঞ্জ, বাঁকুড়া॥ বিপ্লব পাল, রাধাবল্লভ পাড়া, মুর্শিদাবাদ॥ ক্ষিতিশচন্দ্র নাথ, পাথু, করিমগঞ্জ॥

ঘোষণা

বারুইপাড়া লেন, হাওড়া-৪ থেকে রথীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র প্রয়াত অতীন্দ্রনাথ দত্তর স্মৃতিতে একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। তাঁর প্রস্তাব মতো আমরা শুকতারার পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে °অতীন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার জন্যে মৌলিক লেখা চাইছি।

বিষয়বস্তু

'নববর্ষে করিলাম পণ'

°অতীন্দ্রনাথ দত্ত

জন্ম: ১০ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১
মৃত্যু: ১৫ আগস্ট ১৯৮২

পুরস্কৃত লেখা দুটি শুকতারার কার্ত্তিক সংখ্যায় ছাপা হবে। লেখা পাঠাবার শেষ দিন ৩০ আষাঢ়

প্রথম পুরস্কার: ৫০ টাকা॥ দ্বিতীয় পুরস্কার: ৩০ টাকা।

জীবন থেকে নেওয়া

গ্রাম্ফির গোঁ

আরতি বসু

বৃহস্পতি থেকে শনি—পাক্কা তিনটে দিন সূর্যের মুখ দেখা যায়নি। ঝুলকালি মেঘগুলো সকাল থেকে রাত অবধি ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছে আকাশময়। সেইসঙ্গে জুটেছিল হাড়-কাঁপানো বাতাস আর হুল ফোটানো বৃষ্টি। চারদিনের দিন মেঘ কেটে গিয়ে রোদ উঠতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সবাই। যাক রবিবার দিনটা অন্তত মাঠে মারা যাবে না। একে একে মানুষজন হাসিমুখে ঘর থেকে বেরুতে শুরু করল। কেউ যাচ্ছে গীর্জায়, কেউ বাজারে, কেউ গরু ভেড়া চরাতে, কেউ বা ক্ষেত-খামারে।

এদের সব্বার আগে বেরিয়ে পড়েছে গ্রামের ডাকপিওন ডোনা ডসনের বারো বছরের দুই যমজ ছেলে ট্যাম আর উলি। রোদ উঠতে না উঠতেই দস্যি দুটো বাড়ি থেকে দে ছুট। সোজা গিয়ে নেমেছে গ্রামের একপাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝর্ণাটায়। ক'দিনের বৃষ্টিতে ঝর্ণা যে ভরে উঠবে তা ওরা আগে আগেই আন্দাজ করেছিল। উঃ কত জল। আর কী টান জলের। দু একজন পথচলতি মানুষ সাবধান করে দিল, পাথরের ওপর বে-কায়দায় পড়লে কিন্তু হাত-পা ভাঙবে। পরোয়াই নেই দু-ভাইয়ের। হাঁটু অবধি প্যান্ট গুটিয়ে জলের মধ্যে দাপাদাপিতে মহা ব্যস্ত তারা। হঠাৎ ট্যামের চোখে পড়ল হাবুডুবু খেতে খেতে কী একটা যেন ভেসে আসছে স্রোতের সঙ্গে।

ওটা কী রে উলি? ট্যামের কথায় ফিরে তাকাল উলি। একটু নজর করে দেখতেই বুঝতে পারল বস্তুটা কি। উলি চেঁচিয়ে উঠল, আরে! ওটা তো একটা শূকরছানা! শীগগির আয়। ওকে তুলি।

দুজনে মিলে শূকরছানাকে উদ্ধার করে পাড়ে উঠল। জলে ভিজে আর স্রোতের সঙ্গে লড়াই করে ছানাটা তখন একদম ভিজে কাহিল হয়ে পড়েছে। তাকে মুছিয়ে টুছিয়ে চাঙ্গা করে তুলল দু'ভাই। তারপর কোলে নিয়ে হাঁটা দিল বাড়ির দিকে। বাড়ি ফিরেও শান্তি নেই। বাবা জানতে পারলে আস্ত রাখবেন না। কী করা যায়? কতক্ষণ লুকিয়ে রাখা যায়? ভেবে ভেবে কূলকিনারা না পেয়ে বিকেলের দিকে ওকে নিয়ে আবার বেরুল দু'জনে। বরাতজোরে বেরিয়েই দেখা হয়ে গেল সানডি প্রেট্রির সঙ্গে। ওদের পাড়া থেকে খানিকটা দূরেই প্রেট্রির বিরাট খামার। হাঁস-মুরগী-গরু-ভেড়া-ছাগল-শূকর কী না নেই! তাঁকেই ধরে পড়ল ট্যাম আর উলি। বলল, আঙ্কল, আমরা খুব বিপদে পড়েছি এই ছানাটাকে নিয়ে। ঝর্ণার জলে ভেসে যাচ্ছিল, আমরা তুলেছি, কিন্তু এখন কোথায় রাখি কি করি কিছুই বুঝতে পারছি না। বাবা তো কিছুতেই বাড়িতে রাখতে দেবেন না।

প্রেট্রি বললেন, আমার ওখানে রাখতে পার। কিন্তু দেখো বাপু, খাওয়ানো আর পরিষ্কার করার ভার আমি নিতে পারব না।

উলি বলল, না না, ওসব আপনাকে করতে হবে না। আমরা রোজ এসে ওকে খাইয়ে পরিষ্কার করে দিয়ে যাব। এইটুকু তো পথ।

স্যানডি প্রেট্রির খামারে শূওরছানা দিব্বি আছে। সুন্দর একটা নামও পেয়েছে।—গ্রাম্ফি। উলিরা যখনই ফাঁক পায় একবার করে ঘুরে যায়। খরগোশের মতো ছোট্ট শূওরছানা ওদের অন্য সব দুষ্টুমি ভুলিয়ে দিয়েছে।

হপ্তাখানেক পরে প্রেট্রি বললেন, এতই যখন করছ তখন এক কাজ কর না, গ্রাম্ফিকে কার্কব্র্যাকেনের পশুমেলায় নিয়ে যাও। প্রতিযোগিতায় প্রথম কিংবা দ্বিতীয় পুরস্কারটা যদি পেয়ে যায় তাহলে আর ভাবনা কি? কথাটা মনে ধরল উলিদের। সত্যি এমন হাল্কা গোলাপী রঙ, এমন গোলগাল গড়ন আর সুন্দর পাকানো লেজ গ্রাম্ফির ও তো পুরস্কার পেতেই পারে। তবে মুশকিল হচ্ছে পুরস্কার পাওয়াতে হলে আরও অনেক মোটা করতে হবে, অনেক খাওয়াতে হবে। তাছাড়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্নও তো করতে হবে। যা নোংরা ভূত হয়ে থাকে। সুতরাং বালতি চাই, মগ চাই, সাবান চাই।

অতসব ওরা পাবে কোথায়? অবশ্য কোনো অসুবিধে থাকবে না যদি মা একটু সহযোগিতা করেন ওদের সঙ্গে। তা অনেক জপাবার পর মা রাজী হলেন বাড়তি খাবার, বাড়তি সাবান যোগাতে। উলিদের আর পায় কে। গ্রাম্ফিকে পুরস্কার পাওয়াবেই তারা।

পরদিন সকাল থেকেই শুরু হয়ে গেল গ্রাম্ফির পরিচর্যা। গ্রাম্ফি প্রথমটা বুঝতে পারেনি ওদের মতলব। গায়ে আচমকা ঠাণ্ডা জল পড়তেই চমকে ঘোঁৎ করে চেঁচিয়ে উঠল, কিন্তু পালাতে পারল না। ট্যাম ওকে শক্ত করে ধরে আছে কোলের মধ্যে। তারপর যেই না সাবান মাখানো হলো গ্রাম্ফিকে অমনি হড়কে বেরিয়ে গেল হাতের মধ্যে থেকে, ট্যাম উল্টে পড়ল বালতির ওপর। টাল সামলাতে না পেরে উলিও পড়ল। জলে সাবানে চারদিক থৈ থৈ। অনেক কষ্টে গ্রাম্ফিকে বাগে আনা গেলেও সাবানটা আর খুঁজে পাওয়া গেল না। সন্দিগ্ধ সুরে উলি বলল, ট্যাম দ্যাখ তো ওর মুখটা। খেয়ে ফেলল নাকি? ঠিক তাই। ঠাণ্ডা জলের দুঃখ ভুলতে আনন্দে গ্রাম্ফি ফুলের গন্ধওয়ালা সাবানটাই খেয়ে ফেলেছে। ঠোঁটের পাশে জমে আছে সাদা ফেনা। কাণ্ড দেখে দু'ভাইয়ের চোখ কপালে—কী রাক্ষুসে ক্ষিধে রে বাবা! এই মাত্র অত আলু-গাজর, বাঁধাকপি, শালগম, এমনকি দুটো আস্ত চকোলেট পর্যন্ত খাইয়েছে, তবুও ক্ষিধে মেটেনি? শেষে অত দামী সাবানটাও... হতাশ হয়ে সেদিনের মতো পাততাড়ি গুটোল ওরা। তা বলে হাল ছাড়ল না।

মাস দেড়েকের মধ্যেই দেখা গেল আকারে আয়তনে গ্রাম্ফি প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। গায়ের খসখসে রোঁয়াগুলো আর লেজের ডগার

লোমগুলো যেন চকচকে রেশম। হবে নাই বা কেন। এত আদরযত্ন কি কোনো শূওরছানা কোনোকালে পেয়েছে! তবু রোজ স্নানের সময় লড়াই লাগিয়ে দেয় গ্রাফি। বালতি দেখলেই ধাক্কা দিয়ে উল্টে দেয়, আর উলিরা একটু অন্যমনস্ক হলেই সাবান খেয়ে ফেলে। এই করতে করতেই একদিন হঠাৎ এক মহা বিপত্তি ঘটে গেল। ভয়ানক মুষড়ে পড়ল দু'ভাই। গ্রাফির অমর সুন্দর পাকানো লেজটা লাঠির মতো সোজা হয়ে গেছে একেবারে। ব্যাপারটা ঘটেছে অবশ্য ওদেরই দোষে। স্নানের সময় গ্রাফিকে কিছুতেই সামলাতে না পেরে সেদিন ওরা কাঠের দেওয়ালের ছোট্ট ফুটোর মধ্যে দিয়ে গ্রাফির লেজ টেনে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছিল একটা ভারি পাথরের সঙ্গে। খুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে বুঝেছে কী মারাত্মক ভুল হয়ে গেল। একদম সোজা হয়ে গেছে গ্রাফির লেজ। কিছুক্ষণ মনমরা হয়ে বসে থাকার পর ট্যাম বলল, গ্রাফির খুব লেগেছে বুঝলি। লেজ নিয়ে অত টানাটানি করা ঠিক হয়নি। কাল থেকে মালিশ করে দেব, নিশ্চয়ই ঠিক হয়ে যাবে।

কয়েকদিন মালিশ চলল সকাল বিকেল। লেজ কিন্তু ঝুলেই রইল। তারপর কয়েকদিন লেজ পাকিয়ে বেঁধে রেখে দিল উলি। কিছুতেই কিছু না। লেজ ঝুলতেই লাগল লম্বা হয়ে। এদিকে প্রদর্শনীর দিন এগিয়ে আসছে। গ্রাফি আরও মোটা হয়েছে। ট্যাম ওর ছোট্ট ছোট্ট ক্ষুরে কালো পালিশ লাগিয়ে, গায়ে ক্রীম পাউডার ঘষে আরও চকচকে করেছে। কিন্তু লেজ যেমন ছিল তেমনি আছে। একদিন উলি ওকে একটা চকোলেট খেতে দিয়ে পাশে বসে পিঠে হাত বোলাচ্ছে হঠাৎ স্প্রিংয়ের মতো একবারের জন্য পাকিয়ে গেল গ্রাফির লেজ। আনন্দে লাফিয়ে উঠল ট্যাম—উলি, আর একবার আর একবার।

আর একবার কী? জানতে চাইল উলি।

আর একবার তুই গ্রাফির পিঠে সুড়সুড়ি দে।

উলি সুড়সুড়ি দিল আবার। সঙ্গে সঙ্গে আবার একবার গ্রাফির লেজ পাকিয়ে উঠল।

ট্যাম বলল, আর ভয় নেই রে উলি। এইরকম সুড়সুড়ি দিতে দিতেই আমরা প্রথম পুরস্কারটা তুলে আনব।

কথাটা উলির ঠিক মনঃপূত হলো না, লোকে হাসবে না তো?

হাসল তো বয়েই গেল। পুরস্কারটা তো পাচ্ছিই।

কার্কব্র্যাকেনের পশুমেলার খ্যাতি আছে স্কটল্যান্ডের এই এলাকায়। ঠাসাঠাসি ভিড় হয় প্রতিবার। এবারও হয়েছে। দড়ি দিয়ে ঘেরা একটা চত্বরের চারপাশে দর্শক। বিচারকরা রয়েছেন প্রথম সারিতে। গ্রাফির ডাক পড়ল সবার শেষে।

চকোলেট মুখে নিয়ে আসরে ঢুকল গ্রাফি। দু'পাশে দুই ভাই। একজন গলায় হাত বুলোচ্ছে, আর একজন পিঠে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। পশু প্রদর্শনীতে এমন ত্রিমূর্তির আবির্ভাব কেউ কখনো দেখেনি। হাসির গুঞ্জন উঠল দর্শকদের মধ্যে। লজ্জায় লাল হয়ে গেল উলি। গ্রাফিরও এত ভিড়, এত হৈ-চৈ পছন্দ হলো না। দু' একবার ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বিরক্তি জানিয়েই সে হঠাৎ তার লেজ ঝুলিয়ে দিল লম্বা করে। মরিয়া হয়ে ট্যাম তখন হাত দিয়েই গ্রাফির লেজ পাকিয়ে দেবার চেষ্টা শুরু করল। উলি পিঠ চুলকোতে থাকল আরও দ্রুতগতিতে। লেজ একবার গুটোয়, একবার খোলে। কাণ্ড দেখে মেলাসুদ্ধ লোক হেসে লুটোপুটি। অতি কষ্টে হাসি সামলে একজন বিচারক বললেন, ওহে তোমাদের শূওরছানাটি বড়ই সুন্দর, শুধু যদি ওর লেজটা অমন বেমক্কা ঝুলে না পড়ত...

বিচারকের কথা শেষ হবার আগেই কাতর ভাবে ট্যাম বলে উঠল, দয়া করে এক মিনিট সময় দিন স্যার। সব ঠিক করে দিচ্ছি। উলি যা তো দৌড়ে আমার ব্যাগ থেকে সাবানটা নিয়ে আয়।

ফুলের গন্ধওয়ালা সাবান পেয়ে অবশেষে ঠাণ্ডা হলো গ্রাফির মেজাজ। আস্তে আস্তে তার লেজ গুটোতে শুরু করল এবং গুটোতে গুটোতে তৈরি হয়ে গেল সুন্দর একটা ফাঁস।

উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল দর্শকরা। একটা শূওরছানার এত ব্যক্তিত্ব এত মতামত! ভাবাই যায় না। একটু পরে ট্যাম আর উলির সঙ্গে বাড়ির পথ ধরল গ্রাফি। গলায় ঝোলানো রঙিন ফিতে বাঁধা সম্মানপত্রটা ততক্ষণে অর্ধেক খাওয়া হয়ে গেছে। গ্রাফির মতো উলিরাও বুঝেছে খানিকটা বাহবা আর হাততালি কুড়োবার জন্য এত কাণ্ড না করলেও চলত। গ্রাফিকে আর কোনোদিন কোনো পশু নিয়ে যায়নি উলিরা। চেষ্টাও করেনি। গ্রাফির মতোই আছে তাদের কাছে।

ছবিঃ রাহুল মজুমদার

বি. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও ১১ নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রী অরুণচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত

এই জো, সরে যা — ক্যাপ্টেন কিড আমার পাশে দাঁড়াবে... বাঃ! দাঁত আর ছুরির লড়াই দারুণ জমেছে।

উঃ! কী বীভৎস!

হাঙর ও মানুষের ধনুযুদ্ধ দস্যুরা উপভোগ করলেও তনু ঐ রক্তারক্তি দেখে শিউরে উঠল..

গাঁড়ির জল রক্তে লাল করে জলের তলায় অদৃশ্য হ'ল দুই প্রতিদ্বন্দ্বী...

দুটোই বোধহয় শেষ হ'ল। এইবার আমাদের পুরানো খেলাটা শুরু হবে। আরে, এই কুকুরের দল — নরককুণ্ডটা চটপট সাজিয়ে দে। জো, হ্যারী, ললোনেজ — কিডকে নিয়ে তোরা আমার সঙ্গে নরকবাস করবি, — মনে আছে নিশ্চয়?

ভেবেছিলাম হাঙর আর মানুষের লড়াই দেখতে দেখতে সর্দার নরককুণ্ডের কথা ভুলে যাবে — কিন্তু সর্দার দেখছি কিছুই ভোলে না।

গন্ধকের ধোঁয়ায় ভর্তি ঘরের মধ্যে আমাদের থাকতে হবে, আধমরা না হওয়া পর্যন্ত সর্দার ছাড়বে না।

তনুর ভাগ্য ভালো — তাকে আর নরকবাস করতে হ'ল না — হঠাৎ হাঁক দিল জাহাজের প্রহরী...

সর্দার! দুটো যুদ্ধজাহাজ আমাদের দিকে আসছে। ওদের মতলব ভালো মনে হচ্ছে না।

ব্ল্যাক বিয়ার্ডের প্রস্তাব শুনে চমকে উঠল তনু...

গন্ধকের ধোঁয়ায় ভর্তি বদ্ধ-ঘরে বসে থাকতে হবে! সর্বনাশ করেছে — আমি তো দশ সেকেণ্ডও থাকতে পারব না।

ক্যাপ্টেন কিড, তুমি আর আমি এই দুর্বল লোকগুলিকে দেখিয়ে দেব কলিজার জোর থাকলে গন্ধকের ধোঁয়ায় ভর্তি বন্ধঘরেও আরাম করে বসে থাকা যায়।

(চলবে)

মাথা ধরা ? পিঠে ব্যথা ? মচকানো ?

যে কোন ব্যথা বেদনায়
চট্‌পট্‌ দেয় আরাম

অ্যালেন্স
পেইন্‌ বাম

আর্ণিকাপ্লাস ★ লিভোসিন নির্মাতাদের
আর এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন
অ্যালেন্স পেইন্‌ বাম
শরীরের যাবতীয় ব্যথা-বেদনা
উপশমকারী হোমিও মলম।

অ্যালেন্স
পেইন্‌ বাম

ডাঃ সরকার আবিষ্কৃত
পেইন্‌ ফরমিউলা

বিপনন সংস্থা ঃ ফোন-৫৯-৪০৫১
allen's
অ্যালেন্স ইণ্ডিয়া মার্কেটিং প্রাঃ লিঃ
অ্যালেন্স ভবন, কৃষ্ণপুর রোড, কলিকাতা-৫৯

প্রস্তুতকারক ঃ ফোন-৩৫-২৯৬১
Allen
অ্যালেন ল্যাবরেটরিজ প্রাঃ লিঃ
অ্যালেন হাউস, ২২৪/এইচ, মানিকতলা মেন রোড, কলি-৫৪

Jupiter
Emars Allen
Allopathic, Ayurvedic & Homoeopathic
Medicine Manufacturers
Bringing Science To Life

যাদের যত্নেই আপনার আরোগ্য ও আস্থা।
Dr. SARKAR Group
Allen's Ad. India